Government of the Peoples Republic of Bangladesh

Kingdom of the Netherlands

IFAD
Investing in rural people

CDSP

প্রশিক্ষণ মডিউল

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ

চর উন্নয়ন এবং বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন)

বাস্তবায়নে brac | সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা

প্রণয়ন ও সম্পাদনায়

ডাঃ মুনীর আহমেদ
পোল্ট্রি এন্ড লাইভস্টক স্পেশালিষ্ট
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প

সহযোগিতায়

মোঃ আব্দুল বারেক হাওলাদার, *প্রকল্প পরিচালক, সিডিএসপি-বি (এএফ), এলজিইডি*
মোঃ রবিউল ইসলাম, *প্রজেক্ট এগ্রিকালচারিস্ট, এলজিইডি-সিডিএসপি*
মোতাহের হোসেন, *এনজিও সেক্টর স্পেশালিস্ট, সিডিএসপি*
মোঃ মিজানুর রহমান, *এমআইএস এন্ড কম্পিউটার স্পেশালিস্ট, সিডিএসপি*
মোজাম্মেল হক চৌধুরী, *এনজিও সেক্টর স্পেশালিস্ট (ফিশারিজ), সিডিএসপি*
মোঃ লিয়াকত আলী, *এনজিও সেক্টর স্পেশালিস্ট (এগ্রিকালচার), সিডিএসপি*
ডাঃ জান্নাতুল নাইম, *এনজিও সেক্টর স্পেশালিস্ট (জেন্ডার এন্ড নিউট্রেশন), সিডিএসপি*
রাধেশ্যাম সূত্রধর, *প্রকল্প কৃষিবিদ, সিডিএসপি*
মোঃ আবুল কাশেম, *কম্পিউটার অপারেটর, সিডিএসপি*
মোঃ মহসীন উদ্দিন, *ম্যানেজার, ব্র্যাক*
মোঃ হান্নান মোল্যা, *কো-অর্ডিনেটর, এনজিও-১, সিডিএসপি-বি (এএফ), এসএসইউএস*

সার্বিক পরামর্শ

এন্ড্রু জেন্‌কিন্স, *টিম লিডার, সিডিএসপি*
মিহির কুমার চক্রবর্তী, *ডেপুটি টিম লিডার (অবকাঠোমো), সিডিএসপি*
মোঃ বজলুল করিম, *ডেপুটি টিম লিডার (উন্নয়ন), সিডিএসপি*

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩

প্রকাশনায়

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-বি (এএফ)

প্রচ্ছদ

মুনীম ফয়সাল

অঙ্গসজ্জা

মাহদী হাসান

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনায়

প্রিন্ট গ্যালারি, চৌমুহনী-০১৮৭৩৭০০২০০

CDSP

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় উপকূলে জেগে উঠা চর থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ড সরকারের যৌথ সহায়তায় ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প (এলআরপি) গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প ১৯৯৪ সাল হতে শুরু হয় এবং বর্তমানে সিডিএসপি-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) পরিচালিত হয়ে আসছে এবং যা ২০২৪ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত চলবে। বর্তমানে সিডিএসপি-বি (এএফ) প্রকল্পটি চারটি জেলার (চট্টগ্রাম, নোয়াখালী , লক্ষীপুর ও ভোলা) এবং ৮ টি উপজেলা (সূবর্ণচর, কোম্পানীগঞ্জ, কবিরহাট, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, রামগতি, মনপুরা ও তজুমুদ্দিন) অর্ন্তভূক্ত। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হল বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় চরাঞ্চলের অধিবাসী এবং বিশেষ ভাবে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবস্থা ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন। প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনটি স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়।

এর মধ্যে উপকূলীয় চরাঞ্চলের জনগনের টেকসই আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসহ উন্নত প্রযুক্তিতে স্থানীয় হাঁস-মুরগি পালন, গরু মোটা তাজাকরণ ও দুগ্ধবতী গাভী পালন এবং বাজার প্রক্রিয়াজাত করণ উন্নয়ন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ মডিউল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে। জীবন ও জীবিকায়ন সহায়তাকারী খামারিদের দক্ষতা উন্নয়ন, আধুনিক প্রাণিসম্পদ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি, রোগ-নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই উন্নয়ন, সর্বোপরি প্রাণিসম্পদ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই।

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়ন টেকসই করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রাণি স্বাস্থ্য সেবাকর্মী, গবাদিপ্রাণির কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদানকারী, হাঁস-মুরগীর স্বাস্থ্য সেবা কর্মী সৃষ্টি ও তাদের মাধ্যমে নিয়মিত টিকাপ্রদান,ক্রিমি মুক্তকরণ ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের সহযোগিতায় ব্র্যাক ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা সফল ভাবে বাস্তবায়িত করছে।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প, প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জীবন ও জীবিকায়ন সহায়ক/প্রশিক্ষকদের চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় হাঁস-মুরগি উৎপাদন, গরু মোটাতাজাকরণ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সেশন সহায়িকা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এই সহায়িকাটিতে গবাদিপ্রাণির উৎপাদন ও বাজারজাত করণ উন্নয়নের জন্য যাবতীয় তথ্য ও দিকনির্দেশনা সংযোজন করা হয়েছে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, প্রকল্প ভুক্ত এলাকায় প্রাণিসম্পদ উৎপাদন ও উন্নয়নে কার্যকর ভুমিকা পালন করার জন্য উল্লেখিত সহায়তাকারীর দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের জন্য দিকনির্দেশনা মূলক 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি আশাকরি, মডিউল টি সংশ্লিষ্টদের কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সূচারুরূপে পরিচালনায় মডিউলটি সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকায়ন সহায়তাকারীগণ (হাঁস-মুরগি ও প্রাণিসম্পদ) নিজেদেরকে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে তুলবেন। ফলে, তারা দক্ষ হওয়ার পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে খামারিদের সেবা প্রদান এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বিশেষ ভুমিকা রাখবেন।

এ সহায়িকা শুধুমাত্র জীবন ও জীবিকায়ন সহায়তাকারীদের জন্যই নয়, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা বা যারা প্রাণিসম্পদ খামার এর প্রতি আগ্রহী সকলেরই উপকারে আসবে বলে আশা করি।

যুগোপযোগী এ মডিউলটি রচনা, সম্পাদনা ও প্রকাশনায় যারা মেধা, মনন ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ বজলুল করিম
ডেপুটি টিম লিডার (উন্নয়ন)
সিডিএসপি-বি (এএফ)

CDSP

Message

The primary development goal of CDSP-B (AF) is to alleviate poverty and hunger among impoverished individuals residing on newly formed coastal chars in the southeastern coastal region of Bangladesh. This objective has been successfully pursued over the years through a series of distinct phases, with the CDSP making remarkable contributions to the development of these coastal islands. This endeavor involves a unique integrated approach that brings together five to six government implementing agencies and four to eight partner NGOs, with a strong emphasis on engaging women in every aspect of the intervention process through local field level institutions/and NGOs.

In the past year and a half, a total of 810 beneficiaries have undergone training in various livestock-related modules, including local poultry production, small ruminant rearing, beef fattening, and dairy farm management, along with the development of market systems. Regarding livestock, basic training sessions were conducted for 27 groups, comprising the mentioned 810 beneficiaries, with a particular focus on backyard poultry, small ruminant farming, beef fattening, and the potential of dairy farming. Notably, 75% of these beneficiaries have successfully built two-story poultry houses, demonstrating their impressive progress in local poultry rearing within the project.

Furthermore, 48 poultry workers, 16 livestock vaccinators, and 8 Artificial Insemination Service Providers (AISPs) have been delivering essential veterinary services to prevent seasonal endemic livestock diseases, in collaboration with the respective Upazila livestock offices within their designated areas. A total of 7,128 households have benefited from the services provided by these trained livestock vaccinators, who now earn an average monthly income of BDT 12,425. Remarkably, one of the vaccinators in the Aktermiaherhat area has transitioned into a successful dairy entrepreneur, selling Ghee, Sweetmeats, and Curd alongside offering vaccination services.

Additionally, 48 poultry workers (mostly women) received training in vaccination services and served approximately 10,310 households. These workers now earn an average income of BDT 2,054 per month from their vaccination services, as well as the sale of de-wormers and nutritional drugs. In addition, eight AISPs, who received training and support from the Department of Livestock Services (Semen supply), have been providing artificial insemination services both digitally and manually to 3,085 households, earning an average income of BDT 61,844 per month.

Moreover, the establishment of ten demonstration plots for Packchong and Alfa alfa fodder cultivation has been instrumental in providing practical examples and models for farmers to observe and learn from. One of these demonstration farmers has embarked on silage preparation and become a successful silage entrepreneur.

This comprehensive and innovative approach encompasses the prevention of seasonal local livestock diseases through vaccination, primary healthcare, and digital artificial insemination services. These endeavors are carried out by trained NGO staff, livestock vaccinators, poultry workers, and AISPs, all with the aim of supporting the local poultry and livestock farming community and enhancing their livelihoods. In the end, 57,000 households within a project encompassing a population of 514,277 individuals are benefiting through dissemination of these technologies.

I would like to extend my gratitude to the Department of Livestock Services (DLS) and our partner organizations, BRAC and Sagarika Samaj Unnanyan Sangstha, for their unwavering support. I would also like to express my appreciation to my CDSP colleagues for their ingenuity in developing and customizing the livestock training manual.

Andrew Jenkins
October, 2023

বাণী

ব্র্যাক তার কর্মকাণ্ডের শুরু থেকেই দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আশির দশকের শুরু থেকেই ব্র্যাক সারা দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগি পালনের বিস্তৃত কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এসব কর্মসূচি সারা দেশে বিস্তার লাভ করার ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প (সিডিএসপি) নোয়াখালী জেলার চর উন্নয়নে ১৯৯৪ সাল থেকে কাজ করছে। ব্র্যাক ২০০২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সিডিএসপি-২, সিডিএসপি-৩ সরাসরি পার্টনারদের মাধ্যমে এবং সিডিএসপি-৪ ২০১১ সাল হতে ২০১৭ সাল পর্যন্ত পার্টনার এনজিও হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন, ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) এর কার্যক্রম জুলাই ১, ২০২২ থেকে শুরু হয়েছে। ব্র্যাক সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি সিডিএসপি-ব্রিজিং প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়নে নোয়াখালী ও ভোলা জেলার ৪টি উপজেলায় (সুবর্ণচর, হাতিয়া, তজুমদ্দিন এবং মনপুরা) ৮টি শাখার মাধ্যমে (যোবায়ের বাজার, মাইনউদ্দিন বাজার, আলী বাজার, মহিউদ্দিন বাজার, কাঞ্চন বাজার, পাংখার বাজার, চর মোজাম্মেল ও চর কলাতলী) প্রকল্পের ৫টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সিডিএসপি-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) প্রকল্পের আওতায় টেকনিক্যাল টিম এবং ব্র্যাকের যৌথ উদ্যোগে 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। সিডিএসপি-ব্রিজিং প্রকল্প এলাকার প্রায় প্রতি বাড়িতেই হাঁস-মুরগি ও গবাদিপ্রাণি পালন করে থাকে কিন্তু এসব এলাকায় কোনো সরকারি ও বেসরকারি প্রাণিসম্পদ চিকিৎসা কেন্দ্র না থাকায় প্রতি বছর অনেক গবাদিপ্রাণি মারা যায়। আধুনিক পদ্ধতিতে হাঁস-মুরগি ও গবাদিপ্রাণি পালন, টিকাদান, পোল্ট্রি ও লাইভস্টক সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার কার্যকর কৌশল ও ধারণা নিয়ে এই মডিউলে সহজ ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, এই মডিউলটি কর্মসূচির কর্মী ও সদস্যদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। আমি এই মডিউলের সুষ্ঠু ব্যবহার ও সফল বাস্তবায়ন কামনা করছি।

পরিশেষে, এই মডিউল তৈরিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

হোসাইন ইশরাত আদিব
পরিচালক
সমন্বিত উন্নয়ন এবং ওয়াটার, স্যানিটেশন ও হাইজিন কর্মসূচি
ব্র্যাক

নির্বাহী পরিচালক'র কথা

মানুষ ও সমাজের কল্যাণকে ব্রত করে ১৯৮৫ সালে সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন মরহুম ফজলুল হক (হক সাহেব)। সংস্থার প্রতিষ্ঠালগ্নে অক্সফাম-জিবি ও পরবর্তীতে ১৯৯৩ সন থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ধারাবাহিক সার্বিক সহযোগিতায় সংস্থা প্রাথমিক পর্যায়ে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বয়স্ক শিক্ষা ও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেনী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলার অতিদরিদ্র, দরিদ্র, নদী ভাঙ্গা এবং সমাজে পিছিয়ে পড়া ও দূর্যোগে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নসহ উৎপাদন ও আয়বৃদ্ধিমূলক উদ্যোগ সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের কাজ করছে। সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) ও সমাজসেবা অধিদপ্তর এর নির্দেশনা অনুযায়ী এবং পল্লী কর্ম-সাহয়ক ফাউন্ডেশনের বহুমুখী কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাইক্রো ফাইন্যান্সকে আরো গতিশীল, দরিদ্র মানুষের মানবিক চাহিদা ও মর্যাদা এবং সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করার জন্য সংস্থা ভিক্ষুক পুনর্বাসন, সমৃদ্ধি ও প্রবীণ, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও কৈশোর কর্মসূচি, উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষাবৃত্তি, স্বাস্থ্য সেবা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্টাফদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প নোয়াখালী জেলার চর উন্নয়নে ১৯৯৪সাল থেকে অদ্যবদি কাজ করে আসছে। সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৪ সাল থেকেই পার্টনার হিসাবে কাজ করে আসছে। সংস্থা সিডিএসপি-১,২,৩,৪ প্রকল্প অত্যন্ত সফলতা ও সন্তোষজনকভাবে সমাপ্ত করেছে। চর উন্নয়ন ও বসতিস্থাপন স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং এর কার্যক্রম ১ জুলাই ২০২২ খ্রি. থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্প এলাকার জনসাধারনের জীবনমান উন্নয়নে সংস্থার সমিতি বাজার শাখা, বাংলাবাজার শাখা, চর এলাহী বাজার শাখা, গাংচিল (আশার বাজার) শাখা, ভাটিরটেক(ধানসিড়ি) শাখা, আকতারমিয়ার হাট(মোহাম্মদপুর) শাখা, সেলিম বাজার শাখা, দরবেশ বাজার (পূর্বচরবাটা) মোট ৮টি শাখার আওতাধীন কর্মএলাকায় প্রকল্পের পরিকল্পনানুযায়ী ৫টি কম্পোনেন্ট নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সংস্থার সিডিএসপি- ব্রীজিং প্রজেক্ট (এএফ) হওয়াতে সিডিএসপি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সিডিএসপি-ব্রীজিং প্রজেক্ট (এএফ) মাধ্যমে প্রকল্পের টিএ টিম ও সাগরিকার যৌথ উদ্যেগে প্রশিক্ষনার্থী সদস্য ও কর্মীদের কথা বিবেচনায় 'পোল্ট্রি ও লাইভস্টক প্রশিক্ষণ মডিউল' নামে এশটি মডিউল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রকল্প এলাকায় প্রায় প্রতি বাড়িতেই হাঁস, মুরগী, গরু, ছাগল, ভেড়া ও মহিষ পালন করে থাকে কিন্তু এখানে কোন সরকারী বা বেসরকারী পশু চিকিৎসা কেন্দ্র নেই ফলে প্রতি বছর অনেক হাঁস- মুরগী ও গরু, ছাগল মারা যায়। সদস্যদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে এই বইয়ের মধ্যে পরিবেশষ্টিত থাকবে কর্মীদের হাঁস মুরগি পালনের উন্নত ও নতুন নতুন টেকনোলজি, ভ্যাকসিনেশন পদ্ধতি অর্থাৎ লাইভস্টক সম্পর্কিত সমস্যাসমূহের আরো বেশি সহজ, উন্নত কৌশল ও ধারণাসমূহ। এই মডিউল প্রকাশের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সফল হোক সেই কামনা করছি এবং এই সম্পর্কিত সকল ধরণের সার্বিক সহায়তা প্রদানের আশাবাদ ব্যক্ত করছি। মডিউলটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকল ব্যক্তিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প -ব্রিজিং এর কাজ অত্যন্ত সুগঠিত এবং সময়োপযোগী। পূর্বের ন্যায় এই প্রকল্প তার কার্যক্রম বাস্তবায়নে সফল হবে বলে শুভকামনা জানাচ্ছি।

মো: সাইফুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা
চরবাটা, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

CDSP

সম্পাদকের কথা

প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরন প্রশিক্ষণ মডিউলটি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলের তথ্যের আলোকে সম্পাদন করা হয়েছে। বিশেষ করে ডানিডার আরএফএলডিসি, আইএফএমসি-২, ব্লুগোল্ড প্রোগ্রাম, এলডিডিপি প্রকল্প সমূহের এবং এলআরআই, বিএলআরআই সহ অনান্য সংস্থার প্রশিক্ষণ গাইড থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখিত প্রকল্পের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে ভূলত্রুটি হতে পারে, তবুও প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কাজে লাগবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এই কার্যটি সম্পাদন করতে বিশেষ করে চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপনর প্রকল্পের সহকর্মীসহ যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। জনাব মোঃ বজলুল করিম, ডেপুটি টিম লিডার (উন্নয়ন) এর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনায় মডিউলটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে। উনার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এছাড়াও মডিউলটি প্রকাশে, জনাব মোঃ মহসীন উদ্দিন (ব্রাক সংস্থা) ও জনাব মোঃ হান্নান মোল্যা (সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা) কে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা।

উন্নত জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক হচ্ছে শিক্ষিত জাতি ও দক্ষ জনশক্তি, আর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। আর প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি বাস্তবধর্মী প্রশিক্ষণ মডিউল। নোয়াখালীর চরাঞ্চলের হতদরিদ্র মানুষকে দক্ষ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সিডিএসপি প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরন' মডিউলটি প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এই মডিউলটি সিডিএসপির ওয়েবসাইটের ই-লাইব্রেরিতে সংযুক্ত থাকবে। প্রযুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে খামারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ডিম, মাংস, দুধ ও দুগ্ধপন্য উৎপাদন ও বিপনণের জন্য বাজার সংযোগ বহুমুখীকরন, মূল্য সংযোজন, স্থানীয় পর্যায়ে উদ্দ্যোগক্তা উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সংগঠন; ব্র্যাক ও সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থার কর্মী এবং চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্পের সকল সুফলভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে।

ডাঃ মুনীর আহমেদ
পোল্ট্রি এন্ড লাইভস্টক স্পেশালিষ্ট
চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
পানি ভবন, গ্রীনরোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন: +৮৮০-২-২২৩৩৮২৩৭৯

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন নং: +৮৮০২-৫৮১৫২৮০২

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-ব্রিজিং (ভূমি মন্ত্রনালয় অংশ)
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম

বন অধিদপ্তর
উপকূলীয় বন বিভাগ, নোয়াখালী
ফোনঃ ০৩২১-৬১১০৬

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়, নোয়াখালী

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
নোয়াখালী

সহযোগিতায়

রাজকীয় নেদারল্যান্ডস সরকারের দুতাবাস
হাউজ নং-৪৯, রোড নং- ৯০, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ)
হাউজ নং- ১১ (এ), রোড নং- ১১৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২

প্রকল্পের সাহায্যে
প্রধান কার্যক্রম/অর্জন

কি ধরনের কাজ	সিডিএসপি'র মোট অর্জন
বিডব্লিউডিবি	
বাঁধ (কি.মি.)	১৭১
ড্রেনেজ চ্যানেল সমূহ (কি.মি.)	৬৯৪
স্লুইস (এন)	৩১
এলজিইডি	
রাস্তা (কি.মি.)	৭৫০
ব্রিজ এবং কালভার্ট (এন)	৫১২
সাইক্লোন সেল্টার (এন)	১০৬
ডিপিএইচই	
টিউবওয়েল	৪,৩০২
পিট ল্যাট্রিন (এন)	৬১,৪২৩
ভূমি মন্ত্রনালয়	
ভূমি বন্দোবস্ত (একর)	৫১,৪১০
পরিবারের জনসংখ্যা (এন)	৪০,১৬২
বিএফডি	
ম্যানগ্রোভ (হেক্টর)	৯,০৫০
সারিবদ্ধ চারা রোপন (স্ট্রিপ প্ল্যান্টেশন)	১,০৯৯
সামাজিক জীবনযাত্রা	
পরিবারের সংখ্যা	২,০১,১৪৫
উপকৃত জনসংখ্যা	১২,৫৭,৪৮৭

সূচি

ক্রমিক	পাঠপরিকল্পনা	পৃষ্ঠা নং
০১	হাঁস-মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	১১
০২	ডিম পাড়া ও উমে বসা মুরগি (কুঁচো) পালন ব্যস্থাপনা	১৯
০৩	বাচ্চা এবং বাড়ন্ত হাঁস-মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা	২৫
০৪	হাঁস-মুরগি স্বাস্থ্য পরিচর্যা	৩৫
০৫	জীবনিরাপত্তা	৪৩
০৬	কবুতর পালন	৪৮
০৭	গরু ও ছাগল/ভেড়া পালন	৬২
০৮	গবাদিপ্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা	৬৯
০৯	মোটাতাজাকরণের জন্য গরু নির্বাচন ও কৃমিমুক্তকরণ	৭৮
১০	গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ এবং তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা	৮৭
১১	দুগ্ধজাত গাভীর বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে প্রাপ্য বিভিন্ন শংকর জাতের গভীর বৈশিষ্ট্যাবলী ও কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক প্রজনন নিয়ে আলোচনা	৯৮
১২	দুগ্ধ গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা প্রসুতি গাভীর ঘরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রসুতিগাভীর ঘর/বাছুরের বৈশিষ্ট্য বাসস্থানের জন্য স্থানীয় উপকরণ এর ব্যবহার	১০৬
১৩	গর্ভবতী গাভী, নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর বিশেষ যত্ন	১১৫
১৪	গাভীর দানাদার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	১২৩
১৫	উন্নত ঘাস চাষ পাকাচং/নেপিয়ার/জাম্বু/লুসার্ন বা আলফা/জার্মানী	১২৮
১৬	সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসাবে সাইলেজের গুরুত্ব	১৩৫
১৭	ডেইরী কলাকৌশল, ঘি, চিজ, ক্রিম, দই তৈরি ও এর মার্কেটিং ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রয়োগ, ম্যাস্টাইটিস ও মিল্ক ফিভার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	১৪১
১৮	ডেইরী ভ্যালু চেইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা	১৪৮
১৯	কারিকুলাম	১৫৬

হাঁস-মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

পাঠ পরিকল্পনা

ভূমিকা

বাসস্থান হল হাঁস-মুরগির জন্য এমন একটি নিরাপদ স্থান যেখানে তারা বন্যপ্রাণীর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। গ্রামীণ পর্যায়ে সাধারণ বাসস্থান বা উন্নত মানের দু'তলা মুরগির ঘর মুরগী পালন এর জন্য সুবিধাজনক। একটি ভাল বাসস্থান হাঁস-মুরগিকে প্রাকৃতিক দূর্যোগ সহ অন্যান্য অসুবিধা এমনকি চোরের হাত থেকে রক্ষা পেতে সাহায্য করে। গ্রামগঞ্জে দেখা যায় কৃষক তার থাকার ঘরের চৌকির নীচে বা মাটির তৈরি ঘর তৈরি করেও হাঁস-মুরগি পালন করে যা কোন মতেই হাঁস-মুরগি উৎপাদনের জন্য ভাল ভুমিকা রাখে না বরং অন্তরায়। ভাল বাসস্থান না হলে হাঁস-রোগ বালাইতে আক্রান্ত হয়, উৎপাদন কমে যায়, মৃত্যু ও হয়।

উদ্দেশ্য

- কৃষক বাসস্থান ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরণের বাসস্থান বিশেষ করে দো-তলা ঘর সম্পর্কে জানতে পারবে।
- হাঁস-মুরগিকে আলাদা আলাদাভাবে পালন করার গুরুত্ব।
- বাসস্থান তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- হাজলের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা লাভ

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

উপকরণ : ডিম এবং মুরগী পলো, পাটের বস্তা, হাজল প্রস্তুতির জন্য কাদা মাটি, খড় কুটা , কাঠের গুড়া অথবা চালের তুষ, ফ্লিপ চার্ট, একটি আদর্শ মুরগির ঘর, হাজল

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে মুরগীর বাসস্থান নিয়ে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মুরগীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- হাঁস-মুরগীর নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন কেন?
- হাঁস-মুরগীর জন্য কি আলাদা বাসস্থান প্রয়োজন?
- একটি আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য গুলি কি কি?

- আপনি আপনার মুরগীকে ঘরের মধ্যে কিভাবে রাখেন?
- ঘরে কি আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা আছে?
- আপনি কি আপনার মুরগীর বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন? সপ্তাহে কতদিন?
- আপনি কি জানেন একটি মুরগীর জন্য কতগুলি জায়গা প্রয়োজন?
- আপনি কি হাসঁ এবং মুরগী একই ঘরে রাখেন? আলাদা ঘরে রাখার কি কোন সুবিধা আছে?
- মুরগীর বাচ্চা আলাদা ঘরে রাখার সুবিধা কি?
- হাজল কি? কেন দেশী মুরগি পালনে হাজল এত গুরত্ব পূর্ন?
- হাজলে মুরগি পালনে সুবিধা কি কি?
- হাঁস-মুরগীর বাসস্থানের জন্য কি কি বিষয় এর দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়?
- আপনি কিভাবে মুরগীর বাচ্চার জন্য বাসস্থান তৈরি করবেন?

সহায়তাকারী সেশনে একটি আদর্শ মুরগীর ঘরের মাপ, এর জানালা, হাঁস, মুরগী আলাদা রাখার ব্যবস্থা রাখা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি প্রদর্শন করবেন।

সহায়তাকারী স্থানীয়ভাবে প্রাপ্য এবং সহজলভ্য উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন হাজল তৈরির জন্য। উপকরণ এবং হাজল তৈরির প্রক্রিয়া বর্ণনা করবেন। তারপর এক অথবা দুইজন অংশগ্রহণকারীর সহযোগিতা নিয়ে হাজল তৈরি করে দেখাবেন -হাতে কলমে।

আলোচনার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে;

- মুরগীর ঘর তৈরীর উপাদান স্থানীয়ভাবে পাওয়া যাবে কিনা?
- খরচ কেমন হবে?
- হাজল তৈরির উপকরণগুলি কি স্থানীয় ভাবে সহজলভ্য? যদি না হয় তাহলে কোথা থেকে সংগ্রহ করা যাবে?
- খরচ কেমন পড়বে?
- একটি হাজলের সঠিক মাপ কি?
- হাজল তৈরি করা কি খুব কঠিন? এটি কি ব্যয় বহুল?
- হাজলের সুবিধা এবং অসুবিধা সমূহ কি কি?
- কিভাবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, সকল অংশগ্রননকারী ডিমে তা দেওয়া মুরগীর জন্য হাজল তৈরি করবেন?
- আমরা আমাদের এই অভিজ্ঞতা কিভাবে অন্য কৃষকদের মাঝে বিনিময় করতে পারি?

কারিগরি নোট

ভূমিকা

বাসস্থান এমন একটি জায়গা যেখানে হাঁস-মুরগি নিরাপদে, আরামে এবং স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করে। মুরগি একটি উষ রক্তবিশিষ্ট প্রাণি। সুতরাং তারা যেকোন পরিবেশে নিজেদেরকে খাপ খাওয়াতে পারে। তাই বাহিরেরর আবহাওয়ার থেকে রক্ষা পেতে তাদেরকে উপযুক্ত বাসস্থান দিতে হবে। আমাদের দেশে দেশি মুরগি পালনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সুফল না পাওয়ার যে কয়টি কারণ আছে তার মধ্যে অনুন্নত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা যার জন্য ফলন অনেক কমে যাচ্ছে এবং কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই জন্য হাঁস মুরগির ঘর ব্যবস্থাপনা সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে একটি উপযুক্ত বাসস্থানের অভাবে কৃষক আশান্বিত উৎপাদন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভাল বাসস্থানের অভাবে হাঁস-মুরগি রোগাক্রান্ত হয় বেশি, মৃত্যুও হার বেড়ে যায়। অতএব কৃষককে উন্নতমানের বাসস্থানের জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

কেন বাসস্থান গুরুত্বপূর্ন

- নিরাপদে থাকা এবং বিশ্রামের জন্য
- বৃষ্টি বাদলের ও ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করা
- তাপজনিত সমস্যা থেকে রক্ষা
- বন্য প্রাণির বা চোরের হাত থেকে রক্ষা করা
- ডিম পাড়ার জন্য
- সঠিকভাবে খাদ্য ও পানি সরবরাহের জন্য
- রোগমুক্ত রাখার জন্য
- সহজে টিকা প্রদানের জন্য
- পরিচর্যার জন্য

হাঁস-মুরগিকে আলাদা-বাসস্থান দেওয়া দরকার কেন?

গ্রামের অধিকাংশ কৃষক তাদের হাসঁ-মুরগিকে একই বাসস্থানে লালন পালন করে। ফলে বিভিন্ন রোগের আক্রমণের ঝুঁকি বাড়ে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়। দেখা যায় হাঁসের মল-মূত্রে পানির পরিমাণ বেশি যা সহজেই স্যাঁতস্যাঁতে করে ফেলে। এই ধরণের অতিরিক্ত আর্দ্রতা বিভিন্ন জীবানুর বংশ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে যা পরবর্তীতে হাঁস মুরগিকে আক্রমণ করে। এছাড়া বার্ড-ফ্লু নামক একটি সংক্রামক রোগ মুরগিতে ছড়ায় যা কেবল মুরগির জন্য ক্ষতিকর নয় মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যেতে পারে।

একটি আদর্শ বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

- হাঁস-মুরগির বাসস্থান দক্ষিণ মূখী হতে হবে।
- যথেষ্ট আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- হাঁস-মুরগির প্রয়োজনীয় জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে/থাকতে হবে।
- নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- নিয়মিত জীবানুমুক্তকরন।
- অসুস্থ মুরগি বা হাঁসকে সুস্থগুলো থেকে আলাদাকরণ।
- দুর্গন্ধ মুক্ত হতে হবে।
- বৃষ্টির পানি পড়বে না।

থাকার ঘর

সাধারণত দো-তলা / তিন তলা ধরণের ঘরে মুরগি পালন খুবই সহজ। কারণ দোতলা ঘরের উপরের তলার এক খোপে বাচ্চা এবং অন্য খোপে পুলেট বয়সের বাচ্চা রাখা যায়। নীচের তলায় বড় মুরগি পালন করা সহজ। এদেরকে দিনে কিছুক্ষণ রেখে খাদ্য ও পানি দিতে হয় এবয় কিছুক্ষণ ছেড়ে দিতে হবে। এতে করে তারা বাহির থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে।

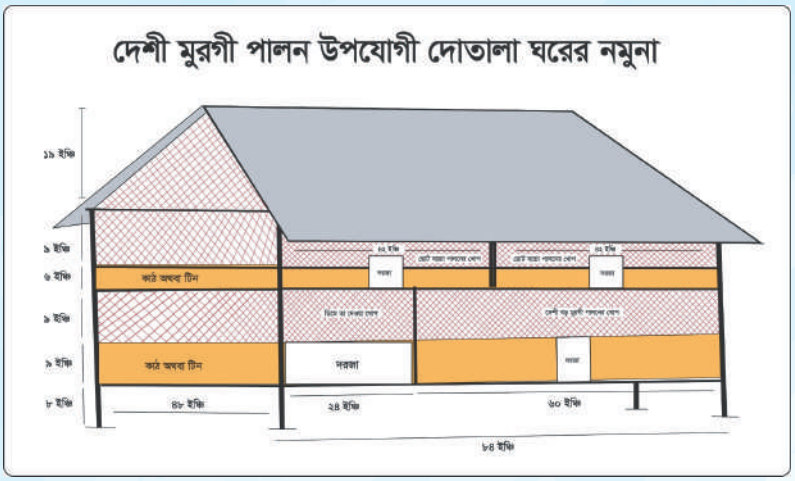

বাস্থানের পরিমাপ

দৈর্ঘ্য=৭ ফুট, প্রস্থ=৪ ফুট, নিচ তলা= ৬০ ইঞ্চি বড় মুরগি থাকার জন্য, নিচ তলা= ২৪ ইঞ্চি বড় মুরগি ডিমে তা দেওয়ার জন্য, উপরের তলা= ৪২ ইঞ্চি, ছোট বাচ্চা পালনের জন্য

একটি ঘর তৈরির নমুনা মূল্যঃ

নং	বিবিরণ	পরিমান	ইউনিট মূল্য	মোট মূল্য
০১	সিরিজ কাঠ	১২ সি এফটি	৩০০	৩৬০০
০২	টিন ৮ ফুট রঙিন)	৪ টি	১৭৫	৭০০
০৩	লোহা	১.৫ কেজি	১৫০	২২৫
০৪	আলতারাজ	৪ টি	৩০	১২০
০৫	কবজা	৮টি	২৫	২০০
০৬	মাকতা	১.৫ টি	১৫০	২২৫
০৭	নেট (প্লাস্টিক- ২২ও ২৪ ফুট)	২২ ফুট	৩৫	৭৭০
০৮	মিস্ত্রি খরচ	৪ দিন	৭০০	২৮০০
অন্যান্য				৩৬০
মোট				৯০০০/-

পোল্ট্রি খামারীরা সাধারণত দুই ধরণের বাসস্থান ব্যবস্থা করে থাকে;

১) আধা-ছাড়া অবস্থায় মুরগি পালন

২) আবদ্ধ অবস্থায় মুরগি পালন

যেখানে মুরগি পালনের জন্য যথেষ্ট জায়গার অভাব সেখানে এ ব্যবস্থা উপযোগি। কিন্তু এ পদ্ধতিতে মুরগি পালনের জন্য ২০-৩০ বর্গগজ জায়গা প্রতিটি মুরগি পালনের জন্য দরকার হয়। মুরগির ঘরের দুই দিকে ও রান ছিটিয়ে বেড়ানোর জন্য জায়গা করে দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে জায়গাকে দুইভাগ করে অর্থাৎ সামনে ১০-১৫ বর্গগজ এবং পিছনে ১০-১৫ বর্গগজ করে জায়গায় রাখা যায়।

বাচ্চা পালন

মুরগির বাচ্চাকে সুস্থ রাখা ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার জন্য আদর্শ বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এই জন্য দরকার হবে পাটের তৈরি চট, শুকনা খড়, বাঁশের তৈরি পলো/ঝাপিন। প্রথমে মাটিতে খড় তার উপর চটটি বিছিয়ে দিতে হবে। তার পলো/ঝাপিন দিয়ে মা মুরগিকে সহ বাচ্চাকে শীতকালে ১০-১৪ দিন , গরমকারে ১ সপ্তাহ বা ৭দিন রাখতে হবে। এভাবে বাচ্চাকে লালন পালন করলে বাহিরের চিল, কাক ও গুই সাপের হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করা যায়। যদি দোতলা ঘর তাকে তাহলে উপরের তলায় চট বিছিয়ে বাচ্চাকে লালন পালন করা যেতে পারে। এক্ষত্রে প্রতিটি বাচ্চাকে ০.৫ বর্গফুট জায়গা হিসাবে ঘরের পরিমাপ রাখতে হবে।

বাচ্চা ও বড় মুরগি একসাথে পালনের কৌশল

একটি দোতলা মুরগির ঘর তৈরি করে বাচ্চা ও মা মুরগি একসাথে পালন করা যায়। এক্ষেত্রে চিত্রে প্রর্দশিত ঘরের মাপ অনুযায়ী একটি আদর্শ মুরগির ঘর তৈরি করা যায়গরের নীচতলায় মা বা বড় মুরগি ১ বর্গফুট জায়গা হিসাবে পালন করা যাবে। পাশাপাশি মুরগি একপাশে হাজলে বসিয়ে ডিমে তা দেওয়ার ব্যবস্থা ও করা যায়। অন্য দিকে বাচ্চাকে ০.৫ বর্গফুট জায়গা হিসাবে পালন করা যাবে। এতে করে অধিকাংশ রোগ-বালাই থেকে মুরগি রক্ষা করা যাবে।

স্বল্প খরচে মুরগির ঘর তৈরি

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ ব্যবহার করে মুরগির দোতলা ঘর তৈরি করা যায় যেমন- বাঁশ, কাঠ, গাছের ডাল, তারের জাল, টিন, খড়, ছন, গোলপাতা, তালপাতা, পলিথিন ইত্যাদি উপরোক্ত মাপ অনুযায়ী ঘর তৈরি করা যায়।

হাঁসের ঘর

হাঁসের জন্য আলাদা ঘর করাই উত্তম। কারণ হাঁস-মুরগি একই খোপে রাখলে রোগ-বালাই হতে পারে। তাছাড়া হাঁসের মল-মূত্রে পানির পরিমাণ বেশি বলে ঘর তাড়াতাড়ি স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে পড়ে। স্বল্প খরচে, স্থানীয় উপকরণ যেমন- বাঁশ, কাঠ, শন, গোলপাতা, পলিথিন ইত্যাদি ব্যবহার করে একতলা বিশিষ্ট ঘর তৈরি করে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে ঘরের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে। হাঁসের বাচ্চার জন্য ০.৫-১ বর্গফুট এবং বড় হাঁসের জন্য ২ বর্গফুট পরিমাণ বাসস্থান দিলে হাঁস আরাম বোধ করবে। হাঁসের ঘরের সামনে কিছু খালি জায়গা রাখলে ভাল হয়, সেখানে হাঁস চড়ে বেড়াতে ও খাবার খেতে পারবে। হাঁসের ঘরের বিছানা হিসাবে তুষ , ছাই বা বালি, কাঠের গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। ঘরের বিছানা চুন দিয়ে রোদে শুকিয়ে জীবানু মুক্ত করতে হবে।

হাজল তৈরি

উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগি পালনের জন্য হাজল ব্যবহার অতীব গুরুত্বপূর্ণ । হাজল ব্যবহারে মুরগি সঠিকভাবে ডিমে তা দিতে পারে এবং বাচ্চা ফোঁটার হার বেড়ে যায়। হাজলে একই সাথে খাদ্য ও পানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকায় মা মুরগির শরীরের ওজন কমার হার অনেক কম হয়। ফলে মুরগি পুনরায় তাড়াতাড়ি ডিম পাড়তে শুরু করে। উৎপাদন সংখ্যা বৃদ্ধিসহ উৎপাদনের পরিমান প্রায় দ্বিগুন হয়ে যায়।

আদর্শ হাজলের পরিমাপ

একটি আদর্শ হাজলের উপরের দিকের ব্যাস হবে ১৬-১৮ ইঞ্চি , নীচের তলা হবে ১০ ইঞ্চি এবং এর উচ্চতা হবে ৭ ইঞ্চি। হাজলে একই সাথে খাদ্য ও পানি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। হাজল তৈরির জন্য এটেল জাতীয় মাটি হলে ভাল হয়। প্রথমে মাটিকে ভালভাবে গুড়া করে পানি দিয়ে কাদার মতো করে তৈরি করতে হবে। কাদার সাথে গোবর/ছোট ছোট খড় কুটা বা অন্য কোন

আঁশ জাতীয় উপাদান মিশাতে হবে। তারপর মাপ অনুযায়ী পুরো হাজল একদিনে তৈরি না করে ২-৩ দিন সময় নিয়ে তৈরি করলে এর ভিত শক্ত ও মজবুত হয়। তারপর ভালভাবে ছুরি বা ধারালো কিছু দিয়ে ছেঁচে ও পানি দিয়ে লেপে একটি সুন্দর আকৃতির হাজল তৈরি করা যায়। একজন সদস্যকে কমপক্ষে ২টি করে হাজল তৈরি করতে হবে।

হাজল ব্যবহারের উপকারিতা

- হাজল মাটি দিয়ে তৈরি করা যায় বলে কোন খরচের দরকার পড়ে না
- মুরগি-ওঠা-নামার সময় হাজল উল্টানোর সম্ভাবনা নেই
- ডিমে সঠিকভাবে তা দেওয়া যায় ও ডিম ঘুরানো সহজ হয়
- একই সাথে খাদ্য ও পানি রাখার ব্যবস্থা থাকায় মা মুরগি তা প্রয়োজনে খেতে পারে। ফলে তা দেওয়ার সময়
- মুরগির শরীরের ওজন কমে না । ফলে পরবর্তীতে মুরগি তাড়াতাড়ি ডিম পাড়ে।
- হাজলে মুরগি একই সাথে খাদ্য ও পানি পায় বলে তা থেকে ওঠে বাহিরে যায় না। যার ফলে ভালোভাবে উম দেওয়া হয় ও ডিম নষ্ট হয় কম। বাচ্চা ফোঁটার হার বেড়ে যায়।

ডিম পাড়া ও উমে বসা মুরগি (কুঁচো) পালন ব্যস্থাপনা

পাঠ পরিকল্পনা

ভূমিকা

আমরা জানি যখন একটি মুরগির মধ্যে কুঁচো ভাব তৈরি হয় তখন সে ডিমের উপর বসে বাচ্চা ফুটানোর চেষ্টা করে। এসময় কুঁচো মুরগির জন্য একটু আলাদা যত্নের ব্যবস্থা নিতে হয়। বৃদ্ধির জন্য মুরগিকে উমে বসা অবস্থায় খাদ্য ও পানি দিতে হবে যা অধিক ডিম উৎপাদনে সহায়ক হবে ও মুরগির তাড়াতাড়ি পুনরায় ডিম দিতে শুরু করবে।

উদ্দেশ্য

- ডিম পাড়া মুরগির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে
- ডিম ফুটানোর জন্য ভালজাতের কুঁচো মুরগি নির্বাচন করতে পারবে
- উমে বসা অবস্থায় কেন মুরগির খাদ্য ও পানি দরকার তা জানতে পারবে
- কিভাবে উমে বসানোর জন্য ডিম নির্বাচন ও সংরক্ষণ করতে হয় তা জানতে পারবে
- কিভাবে উমে বসা মুরগির ব্যবস্থাপনা করতে হয়ে তা জানতে পারবে
- পাঁচদিন পর কিভাবে ডিম পরীক্ষা করতে হয় এবং উর্বর ও অনুর্বর ডিম পৃথক করতে হয় তা জানতে পারবে

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ১ঘন্টা ৫০ মিনিট

উপকরন : পোস্টার পেপার (বড়), মার্কার কলম, অংশগ্রহণকারীদের নোট বই এবং কলম, হাঁস-মুরগীর খাবার , খাবার ও পানির পাত্র , ঝুড়ি, ডিমে তা দেওয়ার হাজল, ছাই, নেপথালিন, খড়, টর্চ-লাইট, উর্বর ও অনুর্বর ডিম, পাঁচদিনের উমে বসা মুরগীর ডিম, মুরগীর বাচ্চা, খাবার পরিমাপ যন্ত্র

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে ডিম পাড়া মুরগী নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের ডিম পাড়া মুরগী ব্যবস্থাপনায় তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- কিভাবে ডিম পাড়া মুরগী সনাক্ত করা যায়?
- কিভাবে বুঝা যায় যে মুরগীটি ব্রুডি কিনা?

- মুরগী কতদিন পর উমে বসবে?
- কিভাবে বুঝবেন কোন ডিমগুলি থেকে বাচ্চা ফুটবে?
- উর্বর ডিমগুলি সনাক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কি?
- হাজল কি?
- উমে বসা মুরগীর কি পানি এবং খাবারের প্রয়োজন আছে?
- উমে বসা মুরগীকে কি খাবার এবং পানি সরবরাহ করে থাকেন?
- কতগুলি ডিম দিয়ে একটি মুরগীকে উমে বসানো হয়?
- উমে বসানো পর মোট কতগুলি ডিম থেকে বাচ্চা পাওয়া যায় (শতাংশ)
- বাচ্চা ফুটার পর মা এবং বাচ্চা কতদিন একসাথে থাকে?
- উম থেকে উঠার পর মুরগীর আবার কতদিন পর ডিম পাড়া শুরু করে?
- মুরগীর ডিম পাড়ার সময়কাল কি কমিয়ে আনা সম্ভব?
- বর্তমানে যে মুরগী এবং ডিম উৎপাদিত হচ্ছে তা কি বাড়ানো সম্ভব (খাওয়া/বিক্রির জন্য)?
- খাদ্য হিসেবে ডিম এবং মাংস খাওয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
- স্থানীয় জাতের ডিম পাড়া মুরগির সুবিধাসমূহ কি কি?
- কুচো মুরগি নির্বাচনের সময় আপনারা কী কী বিষয় বিবেচনা করেন?
- উমে বসা মুরগির যত্ন কিভাবে করে থাকেন?
- গ্রামে বা বাড়ির চারপাশে ঘুরে ঘরে মুরগি সাধারণত কি ধরণের খাবার খেয়ে থাকে ?
- আপনি কি ধরনের খাবার দিয়ে থাকেন?
- মুরগির জন্য উপযোগি খাবার কি কি?
- মুরগি কি সহজে খাবার ও পানি খেতে পারে?
- কিভাবে উর্বর ডিম সনাক্ত এবং তা সংরক্ষণ করা যায়?
- উমে বসা মুরগীর জন্য হাজল গুরুত্বপূর্ণ কেন?
- হাজল কি? হাজলের সুবিধা এবং অসুবিধা সমূহ কি কি?
- একটি আদর্শ হাজলের পরিমাপ কি?
- হাজল তৈরিতে কি কি উপকরণ প্রয়োজন হয়?
- উমে বসা মুরগির জন্য কি ধরণের খাবার প্রয়োজন?
- কখন এবং কিভাবে উমে বসানো ডিম পরীক্ষা করতে হয়?
- ডিম ফুটানোর পর মুরগীসহ বাচ্চা একসাথে কতদিন থাকে?
- বাচ্চা থেকে মা মুরগী আলাদা করার সুবিধাসমূহ কি কি?

একটি উমে বসা মুরগী (কুঁচো) কিভাবে হাজলে বসানোর প্রক্রিয়া দেখাবেন এবং কিভাবে তাদের খাবার ও পানি সরবরাহ করা হয় তা করে দেখাবেন। মুরগীর ওজন মাপার জন্য একটি ওজন মাপার যন্ত্র ব্যবহার করবেন। মুরগীর ওজনের নোট নিবেন। মুরগির ওজনের উপর ভিত্তি করে কত গুলো ডিম তা দেওয়া যায় ঠিক করবেন। কতদিন

পরপর এবং কতবার মুরগীর ওজন নিতে হবে তা নিয়ে অলোচনা করবেন।

সহায়তাকরী ডিমের উর্বরতা পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একটি অন্ধকার রুমে আমন্ত্রণ জানাবেন। একটি টর্চের মাধ্যমে পরীক্ষাটি করে দেখাবেন। এতে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী নিজ হাতে এটি করে দেখবেন।

এভাবে অংশগ্রহনকারী তাঁর আলোচনা চালিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রে তিনি নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির মাধ্যমে তার আলোচনা চালিয়ে যেতে পারেন;

- মুরগির ওজন কত?
- এক কেজি ওজনের মুরগির নীচে কত গুলো ডিম বসানো যায়?
- কত দিনের ডিম পরীক্ষা করতে হয়?
- কি কি দেখে বুঝবেন ডিম উর্বর হয়েছ?
- অনুর্বর ডিম কি করবেন?

কারিগরি নোট

ভূমিকা

দেশী মুরগি পালন সদস্যদের আয় বৃদ্ধি এবং পুষ্টির চাহিদা পূরনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। দেখা যায় কৃষকেরা সনাতন পদ্ধতিতে মুরগি পালনের কারনে দেশী মুরগি থেকে আশানুরূপ ফল পাচ্ছে না। কিন্তু সবাই বলে থাকে মুরগি থেকে আয় কম হচ্ছে। আসলে কৃষকেরা পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে ভাল ফল পাচ্ছে না। তারা যদি কিছুটা পালনের পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনে তাহলে প্রায় দ্বিগুন পরিমাণ লাভ পেতে পারে যা বাণিজ্যিক মুরগি পালনের চেয়ে বেশি হবে।

কুঁচো মুরগির বৈশিষ্ট্য

- মুরগিটি আকারে বড় হবে
- দেখতে ঝকঝকে এবং স্বাস্থ্যবান
- ১.৫-২ কেজি ওজনের হলে ভাল

সাধারণত একটি মুরগি তার শরীরের ওজনের অর্ধেক ওজন সমপরিমান ডিমে তা দিতে পারে। উহাদরণ : মনে করেন একটি মুরগির ওজন ১.৫ কেজি হলে মুরগিটি প্রায় ৭৫০ গ্রাম ওজনের ডিমে তা দিতে পারে। যদি ১টি ডিমের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম হয় তাহলে ঐ মুরগিটি ২০-২২টি ডিমে তা দিতে পারবে।

একটি সুস্থ সবল মুরগির জন্য বিবেচ্য বিষয়

- নিয়মিত টিকা প্রদান ও কৃমিমুক্তকরণ
- নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও ঘরে যথাযথ আলো বাতাস চলাচলের সুবিধা
- বালু গোসলের ব্যবস্থা
- নিয়মিত সুষম খাবার প্রদান

বীজ ডিম সংরক্ষন

সংরক্ষনের অবস্থার উপর ডিমের ফুটার হার ও অনেকাংশে নির্ভর করে। যদি সঠিকভাবে বীজ ডিম সংরক্ষণ করা যায় তাহলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এক সপ্তাহের বেশি ডিম সংরক্ষণ করলে ফুটার হার কমে যায়। মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে হাঁস-মুরগির ৫দিনের ডিমের ফুটার হার বেশি হয়। মুরগি ডিম সর্বোচ্চ ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। সম্ভব হলে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষন করতে হবে । এক্ষেত্রে ১০-১৩ ডিগ্রি তাপমাত্রা উত্তম যদি ডিম ২ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষন করা হয়। উর্বর ডিমগুলো মুরগি পাড়ার সাথে সাথে সংরক্ষণ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগেড তাপমাত্রা রাখলে ভাল থাকবে। ১৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার উপর কোন মতেই না রাখা ভাল। যদি না ঐ সময় তা দেওয়া না হয়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০-৭৫% হতে হবে। গরমকালে ঠান্ডা স্থানে ডিম রাখতে হবে

এবং মাঝে মাঝে ডিমে তিন আঙ্গুলের মাথা দ্বারা পানি ছিটানো দরকার হতে পারে। কারন এই আর্দ্রতায় ডিমের ভিতরের পানি বাষ্পায়িত কম হয় এবং ডিমের কুসুম ডিমের শেলের সাথে লেগে থাকেনা।

ডিম নির্বাচন

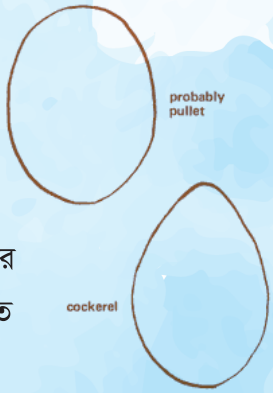

আকার আকৃতি দেখে অনেক সময় মুরগির বাচ্চা মোরগ হবে না মুরগি হবে তা অনুমান করা যায়। যদি আপনি মুরগি পেতে চান তাহলে প্রায় গোলাকার আকৃতির ডিম নির্বাচন করতে হবে। আর মাথা চিকন আকৃতি হলে বাচ্চা গুলো হবে পুরুষ। ডিমগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলে ভাল। যদি ডিমগুলোতে ময়লা থাকে তাহলে তা নরম ভেজা কাপড় দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। নির্বাচিত ডিমগুলো সম-আকৃতির হতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির ডিম হলে ভিতরে বাচ্চা গঠন ঠিকমতো তৈরি হবে না। তাই একই আকৃতির ডিম তা দিতে বসানো উত্তম।

কুঁচো মুরগির পালন ব্যবস্থাপনা

ডিম পাড়া ও কুচে মুরগির ব্যবস্থাপনা (ব্যবহারিক) খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি সেশন। এইসেশনে ডিমপাড়া মুরগির যত্ন/মোরগের যত্ন, ভাল কুচে মুরগি নির্বাচন, কুচে মুরগির যত্ন এবং বাচ্চা ফুটানোর জন্য ডিম ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়সমূহ আলোচনা হবে। ডিমে তা দেওয়ার সময় মুরগি প্রচুর তাপ অবমুক্ত করে যার ফলে তার প্রচুর শক্তি ক্ষয় হয়। তাই উমে বসা অবস্থায় খাদ্য ও পানি দিতে হবে যা অধিক ডিম উৎপাদনে সহায়ক হবে ও মুরগির তাড়াতাড়ি পুনরায় ডিম দিতে শুরু করবে। একটি হাজল তৈরির জন্য কিছু উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। যেমন তলা থেকে দুই ইঞ্চি পরিমাণ ছাই, তার উপর ১টি ন্যাপথালিনের গুড়া এরপর নরম খড় দিতে হবে। এরপর মুরগীর ওজন বা আকৃতি অনুযায়ী ডিম তা তে বসাতে হবে।

ডিম বসানোর পূর্বে গরম করা

শীতকালে ডিম তা দেওয়ার পূর্বে একটু গরম করে নেওয়া উত্তম । এক্ষেত্রে ২৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপ হলেই চলবে।

ডিম বসানোর সময়

বিকাল/সন্ধার সময় মুরগিকে ডিমে বসতে দিতে হবে কারন ২১ দিন পরে মুরগির বাচ্চ একই সময় ফুটবে। তারপর বাচ্চাগুলো মা এর কাছ থেকে উম পাবে ফলে বাচ্চা ঝরঝরে হবে।

ডিম পরীক্ষা

ডিম বসানোর পাঁচ দিন পর ডিমের উর্বরতা পরীক্ষা করতে হবে। সাধারণত উর্বর ডিমে মাকড়সার জালের মতো লাল রংয়ের আকৃতি দেখা যাবে। আর যে গুলো ডিমে এই রুপ চিহ্ন বা লক্ষণ থাকবেনা সে গুলোকে অনুর্বর ডিম হিসেবে ধরে নেওয়া হবে। এই জাতীয় ডিমকে খাওয়ার ডিম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

হাজলে ডিম বসানোর সুবিধা

- সমান্তরালভাবে ডিম বসানো সহজ হয়
- মুরগি সমানভাবে ডিমে তা দিতে পারে
- মুরগি উঠা নামার সময় এটি উল্টে পড়ে না
- খুবই কম খরচ হয়

খাদ্য প্রদান করার কৌশল

উৎপাদনের মুরগির পুষ্টি ও খাদ্য ব্যবস্থাপনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যখন নিজের খাদ্য তালিকা তৈরি করেন তখন সুষম খাবার তৈরির চেষ্টা করেন। মুরগির ক্ষেত্রেও এরূপ চিন্তা করতে হবে। মুরগি সাধারনত তার পুষ্টি বিভিন্ন রকম পোকামাকড় খায়, বাড়ির আঙ্গিনা থেকে শাক-সবজি পাতা ইত্যাদি খেয়ে মিটিয়ে থাকে। আমাদের দেশি মুরগির খাদ্যে ব্যবহারে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। উদাহরন হিসাবে খেয়াল রাখতে হবে আমাদের দুগ্ধবতী মাকে যেভাবে যত্ন নিতে হয়। যদি মুরগি সুষম খাবার না দিই তাহলে সে আশানুরূপ উৎপাদন হবে না।

সুষম খাদ্য

যখন খাদ্য কণার মধ্যে সব ধরনের উপাদান (৬টি উপাদান) থাকে তাকে সুষম খাবার বলে। মুরগিকে সুষমখাবার না দিলে সে বিভিন্ন ধরনের পুষ্টির অভাব জনিত রাগে আক্রান্ত হবে, বৃদ্ধি ও উৎপাদন কমে যাবে। মুরগির খাদ্যের মধ্যে উপাদান হিসাবে থাকে খুদ/চাল ভাংগা, তুষ, ভুট্টা ভাংগা, সয়াবিন, মাছের উচ্ছিষ্ট, ডাল ভাংগা ইত্যাদি। আন্দাজ পরিমাণ খনিজ লবন খাদ্যের সাথে মিশাতে হবে। এক্ষেত্রে ডিমের ফেলে দেওয়া খোসা বা ঝিনুকের গুড়া ব্যবহার করা যেতে পারে। কিছু শাক-সব্জি/পোকামাকড় খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে করে সে ভিটামিন ও অন্যান্য উপাদান পেতে পারে।

আমরা একটি সাধারণ নিয়ম এক্ষেত্রে ফলো করতে পারি। যেমন দুই মুট খুদ/(৫০-৬০) ২ মুট ডাল (২৫ গ্রাম) কিছু কাঁচা, শাক, ১০ গ্রাম বা ১ চিমটি ডিমের খোসা গুড়া-মিক্স করে মুরগিকে খাওয়ানো যেতে পারে। নিয়মিত হাঁস মুরগিকে নিরাপদ পানি দিতে হবে।

এই প্রক্রিয়ার উপকারিতা

- মুরগি ১৫-২৫ দিন পরে পুনরায় ডিম পাড়তে শুরু করে।
- ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ৩টি সাইকেলের পরিবর্তে বছরে ৫-৬টি সাইকেলে উন্নীত হবে
- ডিম উৎপাদন ৫০-১০০ তে উন্নীত হয়।

বাড়ীতে তৈরী সুষম খাবার

বাচ্চা এবং বাড়ন্ত হাঁস-মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

ক্রিপ ফিডিং: ক্রিপ ফিডিং হল এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মুরগির বাচ্চাকে ১ মাস আবদ্ধ অবস্থায় রেখে সুষম খাদ্য, পানি ও প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করা হয়। দেশী মুরগির বাচ্চাকে পালনের এ পদ্ধতি উৎপাদনে খুবই গুরুত্বপূর্ন অবদান রাখতে পারে।

উদ্দেশ্য

- অংশগ্রহণকারীগণ ক্রিপ ফিডিং সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বাচ্চা মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে খাদ্য তৈরির কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- বাচ্চাকে মা-মুরগি থেকে আলাদা করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাচ্চাকে সেলাইন ও ভিটামিন খাওয়ানোর কলাকৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার নিয়ম জানা
- টিকা প্রদান অনুশীলন করবেন।

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ২ ঘন্টা

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

উপকরণ : পলো, মুরগী এবং মুরগীর বাচ্চা, মুরগীর খাবার এবং পানির পাত্র, ঝুড়ি, পাটের ব্যাগ, খড়, তৈরি খাবার, কাঠের গুড়া, ধানের তুষ, ভুট্টার গুড়া, চালের কুড়া, চালের গুড়া, সরিয়ার খৈল, শুটকি ইত্যাদি।

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে সাথে মুরগীর বাচ্চা পালন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশ-গ্রহণকারীদের মুরগীর বাচ্চা পালনে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

- আপনারা কিভাবে হাঁস মুরগীর বাচ্চা পালন করেন?
- আপনারা কি মা মুরগী থেকে বাচ্চাকে আলাদা করেন?
- মুরগীর বাচ্চাকে কি টিকা দিয়ে থাকেন?

- কিভাবে মুরগীর বাচ্চার খাবার এবং পানি সরবরাহ করেন?
- বাচ্চা ফুটার পর কতদিন পর্যন্ত বাচ্চা মায়ের সাথে থাকে?
- শীতের দিনে বাচ্চা কতদিন পর মা-মুরগী থেকে আলাদা করতে হয়?
- গ্রীষ্মকালে কতদির পর মা-মুরগী বাচ্চা থেকে আলাদা করতে হয়?
- মা-মুরগী থেকে বাচ্চা আলাদা করার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো কি কি?
- কোথায় এবং কিভাবে বাচ্চা রাখা প্রয়োজন?
- মুরুগীর বাচ্চা খামারের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে সাধারণত কি খেয়ে থাকে?
- বাড়িতে মুরগীর বাচ্চাকে কি খাবার দিয়ে থাকেন?
- কি ধরনের খাবার দিয়ে থাকেন?
- বাচ্চাদের জন্য উপযোগি খাবার কি?
- বাচ্চাদেরকে কি ধরণের খাবার দিয়ে থাকেন? পরিমাণ কি? কতবার খাবার পরিবেশন করে থাকেন?
- বাচ্চাকে কি পানি খেতে দেন?
- বাচ্চাকে কি স্যালাইন খেতে দেন?
- প্রতিদিন খাবার এবং পানির পাত্র কেন পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন?
- সুষম খাদ্য কি? স্থানীয় উপদান ব্যবহার করে কিভাবে সুষম খাবার তৈরি করা যায়?
- বাচ্চাকে কখন টিকা দিতে হয়? বাচ্চাকে কি ধরণের টিকা প্রদান করতে হয়?
- পুলেট কি? পুলেট পালন গুরুত্বপূর্ণ কেন?

সহায়তাকারী সেশনের পূবেই খাদ্যের বিভিন্ন উপকরণ এবং ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে রাখবেন। সহায়তাকারী ভ্যাকসিন দেখাবনে এবং কোথা থেকে তা সংগ্রহ করা যায় এবং কখন তা দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। যদি সম্ভব হয় তাহলে সুস্থ এবং অসুস্থ মুরগীর বাচ্চা সংগ্রহ করে দেখাতে পারেন। হাতে কলমে খাদ্য তৈরি করে দেখাবেন। এইকাজগুলো করার সময় সহায়তাকারী আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যা নিম্নে দেওয়া হলো;

- বিভিন্ন খাদ্য উপাদানের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন এবং সুষম খাদ্য তৈরির রেশিও নিয়ে কথা বলতে পারেন
- মুরগীর বাচ্চাকে কিভাবে খাদ্য পরিবেশন করতে হয়?
- অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে দিনে তারা কতটুকু খাবার দিয়ে থাকেন
- আমরা আমাদের এই অভিজ্ঞতা কিভাবে অন্য কৃষকদের মাঝে বিনিময় করতে পারি?

কারিগরি নোট

বাচ্চার খাদ্য ব্যস্থাপনা

বাচ্চা ফোটার পর ৭-৮ ঘন্টা পর্যন্ত বাচ্চা গুলোকে মায়ের কাছে রাখতে হবে যাতে করে বাচ্চাগুলো মায়ের উম পেয়ে সতেজ হতে পারে।

বাচ্চা ফোটার ১ম দিন থেকে পরপর তিনদিন খাবার সেলাইন খাওয়াতে হবে। সাধারণত আধা লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানিতে ১মুট গুড়/১ চামচ চিনি, ৮-১০ ফোটা লেবুর রস তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবন, ১/২ গ্রাম অক্সিটেট্রা সাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে খাবার সেলাইন তৈরি করে মুরগির /হাঁসের বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এর ফলে মুরগির বাচ্চার যেমন দূর্বলতা কাটবে অন্য দিকে ভেজা কুসুম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে যা জীবানুর হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চা ফোটার
পর তাকে প্রথমে সেলাইন পানি পরে, ব্রয়লার স্ট্যাটার/ হাতে তৈরি সুষম খাবার দিতে হবে।

বাচ্চাকে ১০ গ্রাম করে প্রথম সপ্তাহে দানাদার সুষম খাদ্য দিতে হবে। ২য় সপ্তাহ থেকে প্রতিটি মুরগির বাচ্চাকে ৫ গ্রাম ও ও হাঁসের বাচ্চাকে ১০ গস্খাম হারে খাদ্যের পরিমান বৃদ্ধি করতে হবে।

একটি বাচ্চার খাদ্যের পরিমাণ (মুরগি/হাঁসের বাচ্চা)

সময় (সপ্তাহ)	মুরগির বাচ্চা	হাঁসের বাচ্চা	মন্তব্য
	পরিমাণ (গ্রাম)	পরিমাণ (গ্রাম)	
১ম	১০	১০	খাদ্য যা তার দ্বিগুণ পানি দিতে হবে
২য়	১৫	২০	
৩য়	২০	৩০	
৪র্থ	২৫	৪০	

হাঁস-মুরগির খাদ্য

হাঁস ও মুরগি তাদের বেঁচে থাকার জন্য , বৃদ্ধি ও উৎপাদনের জন্য যা গ্রহণ করে তাই হাঁস-মুরগির খাদ্য। পোল্ট্রি ফিড সাধারণত গৃহে পালিত হাসঁ-মুরগি কবুতর ও অন্যান্য পাখির খাদ্যকে বুঝায়। শস্য কনা হল পোল্ট্রি ফিডের প্রধান উপাদান। মুরগির ওজন, ঋতু ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মুরগিকে সুস্থ ও সবল রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আমিষ ও শর্করা জাতীয় খাদ্য উপাদান দরকার হয়। অবশ্যই এর সাথে সাথে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি দরকার।

কেন খাদ্য এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ

- সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য।
- শারীরিক গঠন ও বৃদ্ধির জন্য।
- শরীরের পালক তৈরির জন্য সুষম খাদ্য দরকার।
- ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য।
- সুষম খাবার রোগ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে ।

একটি রেশন বা খাদ্য তৈরির তালকায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলো দরকার:

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের পুষ্টি উপাদানগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

১) শর্করা : শর্করা জাতীয় খাদ্য শরীরে তাপ শক্তি যোগায়। যেসব খাবারে শর্করা আছেঃ- ভূট্টা, গম, চালের খুদ,চালের কুঁড়া ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণ শর্করা থাকে।

২) আমিষ : আমিষ দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন এবং ডিম ও মাংস উৎপাদনে সহায়তা করে থাকে। বিভিন্ন ধরণের খৈল যেমন- তিলের খৈল, বাদামের খৈল, সূর্যমুখীর খৈল, সয়াবিন মিল, ফিস মিল ইত্যাদি আমিষের উৎস।

৩) স্নেহ পদার্থ বা চর্বি: চর্বি শক্তি যোগায়, দেহের তাপ সৃষ্টি করে। পালকগুলো চকচকে রাখে। এছাড়া চর্বি মাংসকে সুস্বাদু করে। এটি দেহের তাপ মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৪) ভিটামিন: ভিটামিন রোগ প্রতিরোধ করে। ভিটামিন ২ প্রকার। (১) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন-ভিটামিন এ, ডি, ই, ও, কে এবং (২) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন যেমন- সি ও বি কমপ্লেক্স, বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, শস্য দানা ইত্যাদি ভিটামিন পাওয়া যায়।

৫) খনিজ পদার্থ: খনিজের কাজ- ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করে ডিমের খোসা তৈরি করে, শরীরের অস্থি কাঠামো তৈরি করে। হাড়ের গুড়া ডিমের খোসা, শামুক, ঝিনুকের গুড়া ইত্যাদি খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য।

৬) পানি: বিশুদ্ধ পানির অপর নাম জীবন, তাই মুরগির বেঁচে থাকার জন্য পানির বিকল্প নেই একদিন বয়সের বাচ্চার দেহে ৮৫% পানি থাকে। পুর্নবয়স্ক মুরগির দেহে ৫৫% ভাগ পানি থাকে। যদি এর ১০ শতাংশ কমে যায় তাহলে যে কোন সময় মুরগি ডিম পাড়া বন্ধ হয়ে যতে পারে এমনকি মারা ও যেতে পারে। দেহের দুইটি গুরুত্বপূর্ন প্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মুরগির দেহে পানি খুবই জরুরী।

যেমন : ১। হজম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।
২। শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া সম্পাদন যা শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখা।

সুষম খাদ্য

মুরগির বাচ্চা উৎপাদনে, শারীরিক বৃদ্ধি, পুষ্টির চাহিদা পূরণ ইত্যাদির জন্য সুষম খাদ্য খুবই প্রয়োজন। যদিও খাদ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি খরচ/ব্যয় করতে হয়। যে খাদ্যের মধ্যে খাদ্যের সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। একজন কৃষক বাড়িতে বা তার আশে পাশে পাওয়া যায় এমন সব খাদ্য উপাদান দিয়ে একটি সুষম খাদ্য তৈরি করতে পারে। যেমন: চালর কুড়া, খুদ, ডালজাত শস্য, লবন, সবুজ শাক সবজি ইত্যাদি। এছাড়াও বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর সরবরাহকৃত পিলেট/পোল্ট্রি ব্রয়লার খাদ্য সুষম হিসাবে খাওয়ানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে মুরগির ওজন ও ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষম খাদ্যের বিকল্প নেই।

১ কেজি রেশন/সুষম খাদ্য তৈরি

ক্রমিক নং	উপাদানের নাম	পরিমাণ (গ্রাম)
১	চাল ভাংগা/খুদ/চালের কুড়া/ভূট্টা ভাংগা	৬৫০
২	ডাল ভাংগা	১৫০
৩	শুটকি মাছ	১০০
৪	ডিমের খোসা/ঝিনুকের গুড়া	৪০
৫	লবন	২০
৬	সবুজ শাক সব্জি	পরিমাণমত

মুরগির বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা

বাচ্চাকে দিনের বেলায় বিশেষ যত্ন নিতে হবে। খড় কুটা, চট, খাদ্য ও পানি পাত্র ইত্যাদি দিয়ে বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপরে ঝাপন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে যাতে করে বন্য পাখি আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে পারে। মনে রাখতে হবে ফুটার পর বাচ্চাকে কোন অবস্থাতেই মাটিতে সরাসরি রাখা যাবে না। কারণ ঠাণ্ডার সংস্পর্শে আসরে নিউমোনিয়া সহ অন্যান্য মারাত্মক রোগের আক্রমনে মুরগির বাচ্চা মারা যেতে পারে। দিনের বেলায় মা মুরগি ও বাচ্চাকে একসাথে ঝাপিনের নীচে রাখতে হবে। প্রতিদিন খাঁচার খড় পরিবর্তন করতে পারলে উত্তম হবে অন্যথায় কমপক্ষে সপ্তাহে ৩দিন অবশ্যই করা উচিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুরগির বাচ্চাকে গরমকালে ৫-৭ দিন আলাদা করতে হবে এবং শীতকালে ১০-১৪ দিনে আলাদা করতে হবে।

মা-মুরগিকে বাচ্চা থেকে আলাদা করার ফলে সে তাড়াতাড়ি আবার ডিম পাড়া শুরু করবে। এই সময় মুরগিকে ৫০-৬০ গ্রাম হারে বাড়তি খাবার দিতে হবে যা তার ডিম উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। কৃষককে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, বাচ্চা আলাদা হওয়ার পর মুরগি আর রাতে একসাথে রাখা যাবে না। এক সাথে রাতে থাকরে মুরগির ক্রুডি অবস্থা দূর হতে সময় লাগবে।

এই প্রক্রিয়া বাচ্চাকে একমাস রেখে সুষম খাবার ও পানি দিতে হবে। ১ মাস পরে তারা পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। এভাবে ১ মাস পরে বাচ্চাগুলো পরিবেশ থেকে নিজেরাই খাদ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

বাচ্চাগুলোকে রানীক্ষেত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। প্রথমে বাচ্চার বয়স যখন ৪-৭ দিনের মধ্যে ১ম মাত্রা ১ চোখে ১ ফোটা ২১ তম দিনে ২য় মাত্রা একই নিয়মে প্রদান করতে হবে।

যখন বাচ্চার বয়স ১০-১৪ দিন হবে তখন তাকে পিজিয়ন পক্সের টিকা দিতে হবে।
২৫-২৬ দিন বয়সের মধ্যে ১ ডোজ অক্সিটেট্রা সাইক্লিন জাতীয় ওষুধ সেবন করাতে হবে যা কক্সিডিওসিস রোগ থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করবে।
বাচ্চার বয়স ২৮-৩১ দিনের মধ্যে হলে ফাউল পক্সের টিকা দিতে হবে।
বাচ্চার বয়স ৩ মাস পূর্ন হলে বড় রানীক্ষেত রোগের টিকা প্রদান করতে হবে। তারপর ৪ মাস পরপর এই টিকা চালিয়ে যেতে হবে।

হাঁসের বাচ্চা পালন ব্যবস্থাপনা

হাঁসের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

বাচ্চা ফোটার ১ম দিন থেকে পরপর তিনদিন খাবার সেলাইন খাওয়াতে হবে। সাধারণত আধা লিটার বিশুদ্ধ খাবার পানিতে ১মুট গুড়/১ চামচ চিনি, ৮-১০ ফোটা লেবুর রস তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবন, ১/২ গ্রাম অক্সিটেট্রা সাইক্লিন পাউডার মিশিয়ে খাবার সেলাইন তৈরি করে হাঁসের বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে। এর ফলে হাঁসের বাচ্চার যেমন দূর্বলতা কাটবে অন্য দিকে ভেজা কুসুম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে যা জীবানুর হাত থেকে বাচ্চাকে রক্ষা করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে বাচ্চাকে প্রথমে সেলাইন পানি পরে, ব্রয়লার স্ট্যাটার/ হাতে তৈরি সুষম খাবার দিতে হবে।
বাচ্চাকে পানি পানের ১/২ ঘন্টা পর সুষম খাদ্য দিতে হবে। প্রতি দিনের পানি পরিবর্তন করতে হবে। বাচ্চার জন্য সুষম খাদ্য জরুরী কেননা তা বাচ্চার শারিরিক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং মৃত্যু হার কমায়। প্রথম দিকে খবরের পত্রিকা বা কাগজ বিছিয়ে খাবার দিতে হবে এবং পরে আলাদা খাদ্য পাত্রে দিতে হবে। বচ্চাকে প্রতিদিন ২-৩বার খাদ্য ও পানি সরবরাহ করতে হয়।
৩০টি বাচ্চার জন্য ১টি পানির পাত্র এবং ১৫ টি বাচ্চার জন্য ১টি খাদ্য পাত্র দিতে হবে।

হাঁসের বাচ্চা পানিতে ছাড়ার সময়

সাধারণত হাঁসের বাচ্চার বয়স ১ মাস না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চা পানিতে ছাড়া উচিত নয় কারণ এই সময় হাঁসের বাচ্চার তাপ নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা থাকে না। ছোট অবস্থায় এদের গায়ে লোম থাকে যখন বড় হতে থাকে তখন লোম পড়ে গিয়ে পালক গজায় যা বাচ্চার তাপ নিয়ন্ত্রন করতে সহায়তা করে। তাই বাচ্চার দৈহিক গঠন একটু শক্ত হলে এবং ব্রুডিং সম্পূর্ণ শেষ করার পর পানিতে ছাড়তে হবে। তবে গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন বয়সেই পানিতে ছাড়া যেতে পারে। প্রথম দিন যেন সারাদিন পানিতে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

হাঁস পালনের এত গুরত্বপূর্ণ কেন?

- হাঁসের রোগ বালাই কম হয়।
- হাঁস মুরগির তুলনায় বেশি ডিম দেয়।
- হাঁস নিজে বাহির থেকে খাবার খায়।

হাঁসের বিভিন্ন জাত ও এর বৈশিষ্ট্য

বিভিন্ন জাতের হাঁসের মধ্যে আমাদের দেশে সাধারণত চারটি জাতের হাঁস পালন করা হয় এর মধ্যে জিনডিং ও খাকি ক্যাম্পবেল হাঁস ডিম উৎপাদনের জন্য পালন করা বেশ লাভজনক।

দেশি হাঁস (সাদা ও কাল)

জিনডিং

ইন্ডিয়ান রানার

খাকি ক্যাম্পবেল

মাংস উৎপাদনের জন্য পিকিং ও মাসকবি জাতের হাঁস পালন করা যায়।

দেশি হাঁস

আমাদের দেশি হাঁসগুলো নানা প্রতিকুল পরিবেশে এবং খুবই অল্প যত্নে ডিম ও মাংস উৎপাদন করে থাকে। দেশি সাদা এবং দেশি কালো হাঁসগুলো মাঝারি আকৃতির হয় এবং ৭৫-১০০ টি পর্যন্ত ডিম দিয়ে থাকে।

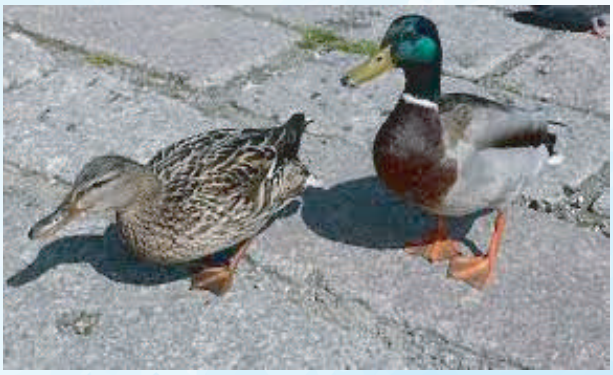

জিনডিং

এই জাতের হাঁসগুলোও অন্যতম ডিম উৎপাদনকারীদের অর্ন্তভূক্ত । হাঁসাগুলো গড়ে ১.৮-২ কেজি এবং হাঁসি গড়ে ১.৫ কেজি ওজন প্রাপ্ত হয়। বৎসরে প্রায় ২৫০-২৭০ টি নীলচে রংয়ের ডিম দেয়। এরা হালকা, দ্রুত চলাচল করতে পারে, ঘাড় লম্বা ও চিকন এবং সাধারণত ১৮ সপ্তাহ বয়সে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। হাসার মাথা ও ঘাড়ের অংশ উজ্জ্বল ও সবুজ রং এবং হাসির রং কালো ও খাকি মিশ্রণ। দৈনিক একটি পুর্নবয়স্ক হাঁস ১৬০-১৮০ গ্রাম খাবার গ্রহণ করে।

খাকি ক্যাম্পবেল

ডিম উৎপাদনের জন্য খাকি ক্যাম্পবেল একটি জনপ্রিয় জাত এই হাঁসগুলোর পালক খাকি রংয়ের এবং মাথা ও ঘাড় ব্রোঞ্জ রংয়ের হয়ে থাকে। হাঁসা ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১-১.৫ কেজি হয় এবং সাধারণত ২০ সপ্তাহে বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। এরা বছরে গড়ে ২৫০-৩০০ টি সাদা রংয়ের ডিম দেয়। প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় প্রতিদিন একটি হাঁস ১৭৬ গ্রাম খাদ্য গ্রহণ করে। এ হাঁস যে কোন আবহাওয়ায় পালন করা যায়।

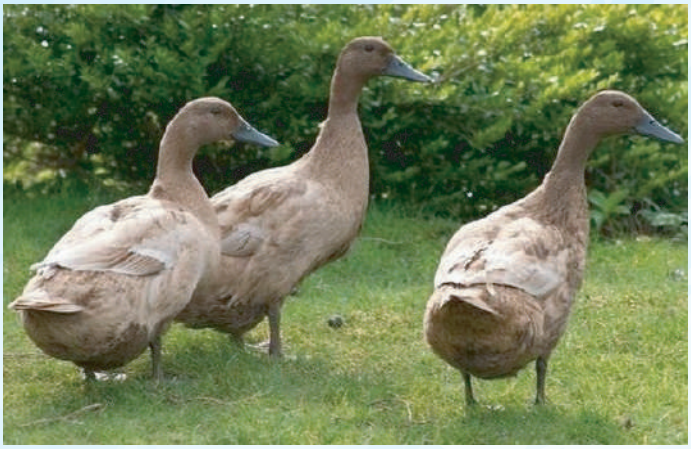

ইন্ডিয়ান রানার

তিনটি উপজাতের মধ্যে সাদা রংয়ের জাতটি বেশি পরিচিত। ঘাড় লম্বা, সুন্দর এবং উজ্জ্বল ও সামান্য গোলাকার । এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঘাড় শরীরের সাথে সমান্তরাল থাকে। হাঁসা গড়ে ২-২.৫ কেজি এবং হাঁসি ১.২ কেজি ওজনের হয় এবং ২০ সপ্তাহ বয়সে প্রথম ডিম পাড়া শুর করে। ইন্ডিয়ান রানার গড়ে বৎসরে ২২০-২৫০ টি ডিম দেয় তবে ডিম অন্যান্য হাঁসের তুলনায় আকারে সামান্য ছোট হয়।

বাড়ন্ত মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা

পূর্ন ৪ মাস বয়স হলে বাড়ন্ত বাচ্চাগুলো পুরাপুরি পরিবেশের সাথে খাপখাওয়াতে পারে। এই সময় সম্পূর্ন স্বাধীনভাবে তারা বাড়ির আঙ্গিনায় চড়ে বেড়াতে পারে ও খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে। ৮-১০ সপ্তাহ বয়সের মুরগির বাচ্চার চাহিদা অনেক তাই এই সময় বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। ৮ সপ্তাহ বয়সের পরে ফিড কনভার্সান রেশিও/এফসিআর কমতে থাকে দেশি মুরগি ৩ কেজি খাবার খেয়ে ১ কেজি ওজন হয়। এফসিআর=৩:১

এই সময় জৈব নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান, বাসস্থানকে রোদে শুকিয়ে নেওয়া, আলো বাতাসের ব্যবস্থা করা, টিকা প্রদান সহ যাবতীয় কাজগুলো করতে হবে।

বাড়ন্ত হাঁস পালন ব্যবস্থাপনা

দেশি মুরগির বাচ্চার জন্য খাবার তৈরি

খাদ্য উপাদান		শতকরা পরিমাণ (%)	পরিমাণ বাটিতে
গম ভাঙ্গা চাল ভাঙ্গা ভুট্টা ভাঙ্গা চালের কুঁড়া	শক্তিদায়ক খাদ্য	৬৫-৭০%	৬.৫-৭ বাটি
তিলের খৈল শুটকি মাছের গুড়া সয়াবিন মিল	ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধিকারক খাদ্য	২৫-৩০%	২.৫-৩ বাটি
ঝিনুক চূর্ণ লবণ ভিটামিন	রোগ প্রতিরোধক খাদ্য	২-৫ %	১/৪ বাটি

নোট : এছাড়াও বাড়ির উচ্ছিষ্টাংশ বিভিন্ন প্রকার শাক-সবজি, শস্য দানা ভিটামিনের উৎস হিসাবে কাজ করে থাকে।

ব্যবহারিক কাজ : স্থানীয় উপাদান ব্যবহার করে এক কেজি খাদ্য তৈরি করে দেখান

	খাদ্য উপাদান		পরিমাণ	পরিমাণ	শতকরা
১	ভুট্টা ভাঙ্গা/ চাল ভাঙ্গা	১৮ মুঠ	৫৫০ গ্রাম	৭০০ গ্রাম	৭০ %
২	চালের কুঁড়া	৫ মুঠ	১৫০ গ্রাম		
৩	তিলের খৈল	৪ মুঠ	১২০ গ্রাম	২৮০ গ্রাম	২৮%
৪	শুটকি মাছের গুড়া	২ মুঠ	৬০ গ্রাম		
৫	সয়াবিন ভাঙ্গা	৩ মুঠ	১০০ গ্রাম		
৬	ঝিনুকের গুড়া/ড়িমের খোসা	১/২ মুঠ	১৫ গ্রাম	২০ গ্রাম	২%
৭	লবণ	২ চিমটি	২ গ্রাম		
৮	ভিটামিন	১ চিমটি	৩ গ্রাম		
	মোট	১০০০ গ্রাম	১০০০ গ্রাম = ১ কেজি	১০০০ গ্রাম = ১ কেজি	১০০ %

মুরগির উৎপাদন চক্র

সনাতন পদ্ধতিতে দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র	উন্নত পদ্ধতিতে দেশি মুরগির উৎপাদন চক্র
ডিম পাড়ার সময়কাল ঃ ২২ দিন (২০-২৪ দিন) ↓ মুরগির ডিমে তা দেওয়াঃ (২১ দিন) ↓ মার সাথে বাচ্চার লালন পালনঃ ৮৫ দিন (৮০-৯০ দিন) ↓ বাচ্চা ছাড়ার পর পুনরায় ডিম পাড়া শুরুঃ ৭ দিন মোট সময়কাল=(২২+২১+৮৫+৭)=১৩৫ দিন। **(মোট বাৎসরিক উৎপাদন চক্র প্রায় ২-৩ টি)**	ডিম পাড়ার সময়কাল ঃ ২২ দিন (২০-২৪ দিন) ↓ মুরগির ডিমে তা দেওয়াঃ (২১ দিন) ↓ মার সাথে বাচ্চার লালন পালন : ১২ দিন (১০-১৫ দিন) ↓ বাচ্চা ছাড়ার পর পুনরায় ডিম পাড়া শুর ১৫ দিন মোট সময়কাল = (২২+২১+১২+১৫) = ৭০ দিন **(মোট বাৎসরিক উৎপাদন চক্র প্রায় ৫-৬ টি)**

হাঁস মুরগির স্বাস্থ্য পরিচর্যা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

হাঁস-মুরগি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রধান প্রধান বাধাসমূহের মধ্যে অন্যতম বাধা হলো বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের আক্রমণ। কৃষকদের রোগবালাই সম্পর্কে যথেষ্ট ধারনা না থাকার কারণে ক্ষতির পরিমাণ অনেক সময় মারাত্মক আকার ধারণ করে। এতে করে কৃষকরা হাঁস-মুরগি পালনে অনাগ্রহী হয়ে উঠে। এই কারণে হাঁসমুরগির রোগবালাই সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশি মুরগি পালন খুব একটি জটিল প্রক্রিয়া নয়। তবে মাঝামাঝে স্বাস্থ্যগত কিছু সমস্যা দেখা দেয়। কিছু কিছু রোগ আছে যেগুলো হঠাৎ করে হাঁস ও মুরগির জন্য মারাত্মক হতে পারে-তাই যেসব রোগ বালাই সম্পর্কে কৃষককে কিছু মৌলিক ধারণা লাভ করতে হবে যাতে করে ঐ সব রোগ-বালাই এ আক্রান্ত হওয়ার আগেই ব্যবস্থা নিতে পারে।

উদ্দেশ্য

- সুস্থ ও অসুস্থ মুরগি সনাক্তকরনের কাজ।
- সুস্থ ও অসুস্থ মুরগি সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে সে সম্পর্কে জানা।
- কিছু কিছু সাধারন রোগবালাই সম্পর্কে ধারনা লাভ।
- কোন কোন রোগ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ সে সম্পর্কে ধারণা লাভ।

সশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ২ ঘন্টা

উপকরণ : বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সহ ফ্লিপচার্ট পোস্টার পেপার (বড়), পোল্ট্রির বিভিন্ন ভ্যাকসিন, ডিস্টিল ওয়াটার, গ্লাস/কাপ, ফ্লাক্স

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।
সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে সাথে পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ, এর প্রতিকার এবং ভ্যাকসিন প্রদান সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে

- রোগ বলতে কি বুঝেন?
- রোগ কিভাবে আপনার হাঁস-মুরগির বাচ্চাকে আক্রান্ত করে থাকে
- কিভাবে সুস্থ এবং অসুস্থ মুরগি চিহ্নিত করা যায়?
- হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা কি?
- হাঁস-মুরগির ভ্যাকসিন সম্পর্কে ধারনা
- আপনার এলাকায় কি ধরণের রোগ সাধারণত: বেশি হয়ে থাকে?
- মুরগির কিছু সাধারণ রোগের লক্ষণ সমূহ যেমন রানীক্ষেত, ফাউল পক্স, কক্সিডিওসিস এবং প্যারাসাইটিক রোগসমূহ?

- মশা-মাছি এবং পোকা-মাকড় নিয়ন্ত্রণে কি করে থাকেন?
- একটি সুস্থ এবং একটি অসুস্থ মুরগির পার্থক্যসমূহ কি? কি?
- মুরগির রোগ প্রতিরোধে কি ধরণের ভ্যাকসিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে?
- কোথা থেকে ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে থাকেন?
- মুরগির বাচ্চাকে কখন ভ্যাকসিন দিয়ে থাকেন?
- আপনি কি মনে করেন ভ্যাকসিন দেওয়ার পর মুরগি মারা যাচ্ছে
- বিভিন্ন পরজীবি দ্বারা কিভাবে মুরগি আক্রান্ত হয়ে থাকে এবং এটি কিভাবে প্রতিরোধ করা যায়
- মুরগির কোন রোগ কি মানুষের জন্য ক্ষতিকর? কিভাবে সেটি প্রতিরোধ করা যায়?

সহায়তাকারী সেশনের পূর্বে ই বিভিন্ন রোগ সম্বলিত পোস্টর এবং ফ্লিপ চার্ট এবং ভ্যাকসিন সংগ্রহ করে রাখবেন। সহায়তাকারী ভ্যাকসিন দেখাবনে এবং কোথা থেকে তা সংগ্রহ করা যায় এবং কখন তা দিতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন ও হাতে-কলমে দেখাবেন । যদি সম্ভব হয় তাহলে সুস্থ এবং অসুস্থ মুরগীর বাচ্চা সংগ্রহ করে দেখাতে পারেন।

কারিগরি নোট

ভূমিকা

স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তনকে রোগ বলে। রোগ বালাই ও হাঁস- মুরগিকে সমানভাবে আক্রান্ত করে যা তাদের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। দেশীয় হাঁস-মুরগি পালন অনেক সময় আনন্দের কাজ হিসাবে ও নিয়ে থাকে। মানসম্মত ডিম ও মাংস উৎপাদনের জন্য দেশী মুরগি পরিবারে একটি সদস্যের মতো ভূমিকা রাখে। শুধু কেবল ডিম ও মাংস উৎপাদনই করে না হাঁস-মুরগি গরীব মানুষের আয় বৃদ্ধিতেও অনেক অবদান রাখে যা কৃষকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে। সাধারন কিছু রোগ-বালাই আছে যা কৃষকের অর্থনৈতিক ক্ষতি সাধন করে থাকে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হলো বহি: ও আন্ত: পরিজীবির আক্রমন, সংক্রামক রোগ ও পুষ্টিজনিত সমস্যা:
সাধারণ সংক্রামক রোগ হলো: ১) রানীক্ষেত রোগ ২) গামবোরো ৩) ফাউল পক্স ৪) কক্সিডিওসিস, সি.আর.ডি ও পলোরাম ইত্যাদি

পরজীবি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

মুরগির শরীরে বিভিন্ন ধরণের পরজীবির আক্রমন লক্ষ্য করা যায়। যেমন উকুন, আঠালি ইত্যাদি।

লক্ষণ

- গায়ের পালক নষ্ট হয়ে যায়
- রক্ত শূন্যতা
- চুলকানি/বিরক্তিকরভাব

ব্যবস্থাপনা

দেশি মুরগির শরীরের প্রতি নিয়মিত লক্ষ্য রাখা উচিত এবং তিন মাস অন্তর বহি: পরজীবির জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দেশি মুরগি বালি/গোসলের ব্যবস্থা করতে হবে। মুরগির ঘরের পাশে বা বাড়ির আঙ্গিনায় সুবিধাজনক স্থানে একটি গর্ত করে কিছু বালি দিতে হবে যাতে মুরগি সহজে বালি গোসল সম্পন্ন করতে পারে। বালি গোসলের মাধ্যমে মুরগি তার নিজের শরীরকে পরিষ্কার করে নেয় এবং বহি: পরজীবিকে মুক্ত করে।

আন্ত:পরজীবি : দেশি মুরগি আন্ত: পরজীবি দ্বারাও প্রচুর পরিমাণে আক্রান্ত হয়। কিছু পরজীবি আছে যেগুলো খালি চোখে দেখা যায় আবার কিছু দেখা যায় না। আন্ত:পরজীবিগুলো মুরগিকে আক্রান্ত করে তাঁর শরীরের পুষ্টিকে খেয়ে ফেলে যা পরবর্তীতে ডিম উৎপাদন কমিয়ে দেয়। একটি আক্রান্ত মুরগি থেকে আরেকটি সুস্থ মুরগিতে ক্রিমির ডিম এর মাধ্যমে সংক্রমিত হয়।

লক্ষণ

- শরীরের ওজন কমে যায়।
- মাথার ঝুঁটি ফ্যাকাশে হয়ে যায়।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।
- ডায়রিয়া দেখা দেয়।
- পালক উসকো খুসকো হয়ে যায়।
- খাবার খেতে অনীহাভাব দেখায়।
- বুকের হাড় বাহির হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- বাসস্থান ব্যবস্থা উন্নত করা এবং আক্রান্ত বাসস্থান পরিষ্কার করা
- তিন মাস অন্তর ক্রিমির ঔষধ খাওয়ানো

মুরগীর পায়ে যদি স্কেলী হয় তাহলে তার আক্রান্ত পা পানিতে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে আলতোভাবে ব্রাশ করতে হবে।

কক্সিডিওসিস

সাধারণত: বাড়ন্ত মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। ৫-৬ সপ্তাহ বয়সের মুরগি আক্রান্ত হয় বেশি। মুরগি বিভিন্ন প্রজাতির প্রটোজোয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়।

কিভাবে মুরগি কক্সিডিওসিস এ আক্রান্ত হয়

মুরগির ঘর কক্সিডিয়ার জীবানু দ্বারা আক্রান্ত থাকলে বাড়ন্ত মুরগি সহজে আক্রান্ত হয়। অথবা মুরগির লিটার বা শোয়ার জায়গা যদি ভেজা থাকে তাহলেও আক্রান্ত হতে পারে।

কক্সিডিওসিস এ আক্রান্ত মুরগির লক্ষণ

- পায়খানার সাথে রক্ত দেখা যায় এবং পায়খানা মলদ্বারের চারপাশে লেগে থাকে ।
- আক্রান্ত বাচ্চা খাদ্য কম খায়, ডানা ঝুলে পড়ে এবং মাথা বাকিয়ে ডানার মধ্য দিয়ে বসে ঝিমাতে থাকে।
- পালক উশকো-খুশকো হয়ে যায়। বাচ্চা নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

খাদ্যের সাথে এ্যান্টি কক্সিডিয়াল ঔষধ মিক্স করে বা পানির সাথে মিশিয়ে ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা তৈরি করা যায়। মুরগির বিছানা সব সময় শুকনা রাখতে হবে। কোনমতে ভেজা বা স্যাঁতস্যাতে রাখা যাবে না। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ রোগের প্রকোপ দেখা যায়। তাই বর্ষাকালে রোদ্র দেখার সাথে সাথে বিছানা শুকিয়ে নিতে হবে অথবা পরিবর্তন করতে হবে।

সংক্রামক রোগ

ফাউল পক্স

ফাউল পক্স মুরগির ভাইরাসজনিত একটি সংক্রামক রোগ। রোগটির সুপ্তকাল ৪-২০ দিন। তাই মুরগির বাচ্চা বেশি পরিমানে আক্রান্ত হয়। তবে বড় মুরগিও এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। মুরগি ছাড়াও আমাদের দেশে কবুতর, কোয়েল এ রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়। সাধারনত: দুইভাবে এ রোগ দ্বারা মুরগি আক্রান্ত হয়ে থাকে

- পোকার কামড় বিশেষ করে মশায় কামড়ালে
- শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে
- রোগটি নভেম্বর থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ

- মাথার ঝুটি, কানের লতি ও চোখের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটি দেখা যায়।
- যেখানে পালক থাকে না ঐসব স্থানে চামড়ার উপর গুটি দেখা যায়।
- নাকে মুখে ভেজা স্থানেও গুটি দেখা যায়।
- শরীরে প্রচন্ড রকম জ্বর থাকে এবং কাজে অনীহা দেখা যায়।
- বাচ্চাগুলো ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় বা কয়েকদিনের মধ্যে মারা যেতে পারে।
- এ রোগে মুরগি আক্রান্তের হার ১০-৯৫% এবং মৃত্যুর হার ০-৫০%।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনরূপ চিকিৎসা ছাড়াই মুরগি সুস্থ হয়ে যায়। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২য় পর্যায়ে অন্যান্য জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। একবার আক্রান্ত মুরগি সারা জীবনের জন্য প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। এ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। একমাত্র টিকা দানের মাধ্যমেই এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। চার সপ্তাহের পর মুরগীকে যে কোন সময় এ রোগের টিকা দেওয়া যায়।

শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট জনিত রোগ (সি.আর.ডি)

বিভিন্ন প্রজাতির জীবানু দ্বারা মুরগি এ রোগে আক্রান্ত হয়। যেমন, পরজীবি, ধুলা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, জীবানু।

লক্ষণ

- শ্বাস কষ্ট, সর্দি কাশি।
- নাক ও চোখ থেকে পানি পড়া।
- গলার ভিতর গড় গড় শব্দ এবং হাঁ করে শ্বাস নেওয়া।
- খাদ্য গ্রহন এবং ডিম উৎপাদন কমে যায়

প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- সঠিক বাসস্থান প্রদান
- সুষম খাদ্য প্রদান
- অসুস্থ হলে সাথে সাথে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন

রানীক্ষেত

রানীক্ষেত ভাইরাসজনিত রোগগুলোর মদ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ছোঁয়াছে রোগ। প্রথমে এই রোগটি ইংল্যান্ডের নিউক্যাসল নামক স্থানে ১৯২৬ সালে আবিষ্কৃত হয়। দেশীয় পোল্ট্রি এ রোগের প্রতি খুবই সংবেদনশীল। পোল্ট্রি শিল্পতে এ রোগ ভীষণ ক্ষতি করে থাকে। শীত ও বসন্তকালে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

লক্ষণ

- তীব্র আকারে দেখা দিলে ১০০% মারা যায়।
- সাদা চুনের মতো পাতলা পায়খানা হয়।
- ডানা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে।
- নাক দিয়ে পানি পড়ে।
- মুরগির মাথা ও ঘাড় বাঁকা হয়ে যায়।
- মুখ হা করে লম্বা লম্বা শ্বাস নেয় ও শব্দ করে কাশতে থাকে।
- ডিম উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

- এ রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে সুস্থগুলোকে আলাদা করে ফেলতে হবে
- নতুন মুরগী বাড়িতে আসার সাথে সাথেই টিকার ব্যবস্থা করতে হবে।
- নিয়মিত টিকা প্রদান-টিকাদান কর্মসূচিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে

হাঁসের রোগ

হাঁসের রোগ বালাই কম। স্বাস্থ্যসম্মত জায়গা, পরিস্কার ঘর, পর্যাপ্ত পানি এবং সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা গলে রোগ বালাই কম হয়। আবদ্ধ অবস্থায় রোগ দেখা দিলে মৃত্যুহার বেশি হয়। আমাদের দেশে হাঁসের প্রধান রোগ মূলত: ৩ টি যথা; ডাক প্লেগ, ডাক কলেরা. বুটলিজম।

ডাক প্লেগ

কারণ: এটি একটি ভাইরাসজনিত সংক্রামক রোগ, যা যে কোন বয়সের হাঁসে আক্রান্ত হতে পারে।

ডাক প্লেগের লক্ষণঃ

- হাঁস দূর্বল হয়ে দাঁড়াতে পারে না বা খুঁড়িয়ে বা বুকের উপর ভর করে হাঁটে এবং সাঁতার কাটতে চায় না।
- হাঁস মারা যাওয়ার পর বা কোন কোন সময় মরার পূর্বে পুরুষাঙ্গ বাইরে ঝুলতে দেখা যায়।
- নাক দিয়ে পানি পড়ে, সবুজ বা হলুদ পাতলা পায়খানা করে এবং কোন কোন সময় রক্ত পড়ে।
- রোগের লক্ষণ বাড়ার সাথে সাথে খাদ্য গ্রহণ কমতে থাকে কিন্তু তৃষ্ণা বেড়ে যায়। মৃত্যুর হার ৫-১০০% হয়ে থাকে।

প্রতিরোধ : জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

ডাক কলেরা :

কারণ : ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ ছড়ায়।

ডাক কলেরার লক্ষণ

- অনেক সময় মারা যাওয়ার মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- হাঁসের ক্ষুধা কমে যায় কিন্তু পিপাসা হয়।
- হাঁস সবুজ বা হলদে সবুজ পাতলা পায়খানা করে।
- আক্রান্ত হাঁসের মুখ দিয়ে পিচ্ছিল তরল পদার্থ বের হয়।
- অনেক সময় পায়ের গিট ও মাথা ফুলে যায়।
- মৃত্যুর হার ২০-২৫% পর্যন্ড় হতে পারে।

প্রতিরোধক : জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং রোগ হওয়ার আগে প্রতিরোধক টিকা দিতে হবে।

হাঁসের বটুলিজম :

কারণঃ ব্যাকটেরিয়া কর্তৃক তৈরি বিষাক্ত পদার্থের জন্য খাদ্যে বিষক্রিয়া ঘটে।

লক্ষণ :

- অতি তীব্র হলে হঠাৎ হাঁস মারা যায়
- কম হলে প্রথমে দূর্বলতা দেখা যায়, হাঁস নিস্তেজ হয়ে পড়ে ।
- ডানা ঝুলে পড়ে, হাটতে পারে না এবং ঘাড় মাটিতে হেলে পড়ে।

প্রতিরোধ :

পঁচা অথবা বাসি খাবার খাওয়ানো যাবে না। মৃদু আক্রান্ত হাঁসকে তুলে এনে পরিস্কার স্বচ্ছ জলাশয়ে রাখতে হবে।

মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি আছে এমন রোগবালাই

বার্ড ফ্লু

লক্ষণ

- কোন লক্ষণ প্রকাশের পূর্বেই মুরগি মারা যাবে।
- মুরগি হাটার সময় পায়ের সাথে পায়ের সমন্বয়হীনতা।
- সর্দি-কাশির লক্ষণ থাকবে।
- নাক দিয়ে পানি পড়া।
- কানের লতি, মাথার ঝুঁটি, পা এ রক্ষবর্ণ দেখা যাবে।
- রানীক্ষেত রোগে মানুষের চোখ আক্রান্ত হতে পারে এবং চোখের ওঠা রোগ হতে পারে।

অপুষ্টিজনিত রোগ বালাই

দেশিজাতের মুরগীকে সাধারণত সুষম খাবার দেওয়া হয় না । তারা নিজেরাই বাড়ির আশ-পাশ থেকে বেশির ভাগ খাদ্য খেয়ে থাকে। কিন্তু এই খুঁজে খাওয়া খাবারের মধ্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান থকে না এবং মুরগীর পুষ্টির অভাব পূরণ হয় না। ফলে কিছু সাধারণ রোগ দেখা যায় যেমন: রিকেটস, দূর্বল স্বাস্থ্য, ওজন কমে যাওয়া, ডিম উৎপাদন কমে যাওয়া বা পূর্ণমাত্রায় পালক তৈরি না হওয়া।

একটি সুস্থ ও অসুস্থ মুরগি চেনার উপায়

সুস্থ মুরগি	অসুস্থ মুরগি
১.মুরগি সবসময় সতর্ক এবং অধিকাংশ সময় দাড়ানো থাকবে	১.ক্লান্ত ও জীবনহীন মনে হবে
২.চোখ ও মাথার ঝুটি উজ্জ্বল থাকবে	২. .চোখ ও মাথার ঝুটি অনুজ্জ্বল থাকবে
৩.স্বাভাবিক হাটা, চলা ও খাওয়া দাওয়া করবে	৩.খাওয়া দাওয়া কমে যাবে
৪. ডিম উৎপাদন স্বাভাবিক থাকবে	৪.ডিম উৎপাদন কমে যাবে বা বন্ধ হয়ে যাবে
৫. গায়ের পালক মসৃন ও পরিষ্কার থাকবে	৫. গায়ের পালক উস্কো খুস্কো/এলোম্যালো ও অপরিষ্কার থাকবে
৬. নরম ও ঘন/স্বাভাবিক পায়খানা করবে।	৬. পানিযুক্ত, রক্তময় বা ক্রিমি/ডায়রিয়া যুক্ত পায়খানা করবে।
৭.শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক থাকবে।	৭. নাক ও মুখ দিয়ে কফ বা পানি ঝরবে।

জীবনিরাপত্তা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

হাঁস- মুরগি পালনের ক্ষেত্রে জীব নিরাপত্তার বিষয়টি আমাদের দেশের কৃষকদের জ্ঞ নাই বললেই চলে। যার কারণে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাইয়ের দ্বারা খামারের ভীষণ ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।

উদ্দেশ্য

এ সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগন নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

- জীব নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা লাভ
- জীব নিরাপত্তার গুরুত্ব
- দেশি মুরগীর মৃত্যুর কারন কি কি
- জৈব নিরাপত্তার জন্য কি কি ব্যবস্থা নিতে হবে
- কৃষকরা নিজেদের মধ্যে এলাকায় বিভিন্ন রোগ সম্পর্কে মত বিনিময় করবে
- বছরের কোন সময়ে কোন কোন রোগ দেখা দেয়
- ঋতু ভিত্তিক রোগ পঞ্জিকা তৈরি করবে

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

সময় : ১.৫ ঘন্টা

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

প্রশিক্ষণ উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট, পোস্টার ইত্যাদি

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন । সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে সাথে মুরগীর বিভিন্ন রোগ এবং অন্যান্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- জীব নিরাপত্তা কি?
- আপনি কি জানেনন কিভাবে আপনার মুরগী আক্রান্ত হয়?
- রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা
- টিকা কী?
- টিকা কেন দেয়া হয়?
- বছরের কোন সময়ে রোগের প্রার্দুভাবে বেশি হয়?

সহায়তাকারী আলোচিত বিষয় পোস্টার পেপারে লিখে রাখবেন (যেমন মুরগীর মৃত্যুর জন্য কি কি কারণ বেশি দায়ী ইত্যাদি) মুরগীর রোগ হলে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী কি পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন তার উপর সারসংক্ষেপ তৈরি করবেন এবং পরবর্তী আলোচনা শুরু করবেন।

- জীব নিরাপত্তা কি?
- মুরগী পালনে এর গুরুত্ব কি?
- জীব নিরাপত্তা বিবেচনায় কি কি উপাদান ফার্মে মুরগীর রোগ বিস্তারের জন্য দায়ী?
- আপনি কিভাবে আপনার ফার্মের জন্য তা মেনে চলবেন
- আপনার এলাকায় কি কি ধরণের রোগ হয়ে থাকে?
- স্থানীয়ভাবে এই রোগগুলোকে কি নামে অভিহিত করা হয় ? রোগের প্রকৃত নমি কি?
- টিকা কী?
- টিকা কেন দেয়া হয়?
- টিকা না দেয়া হলে সমস্যা কি ?
- টিকা কিভাবে পরিবহণ করা উচিৎ এবং ব্যবহার করার সময় কোন কোন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা উচিৎ?
- রোগ বিস্তারে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব কি?

সহায়তাকারী সেশনের পূর্বেই ট্রে, পানি, পটাসিয়াম-পার ম্যাঙ্গানেট, পোস্টার পেপার এবং মার্কার সংগ্রহ করে নিয়ে আসবেন। সহায়তাকারী পটাসিয়াম-পর-ম্যাঙ্গানেটের ব্যবহার দেখাবেন এবং তার গুরুত্ব আলোচনা করবেন। এই কাজ গুলো করার সময় সহায়তাকারী আলোচনা চালিয়ে যাবেন এবং মাঝে মাঝে কিছু প্রশ্ন করতে পারেন যা নিম্নে দেওয়া হলো;

- উপাদানগুলি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায় কিনা? না পাওয়া গেলে কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- খরচ কেমন?
- কোথা থেকে পাটাসিয়াম-পার-ম্যাঙ্গানেট সংগ্রহ করা যাবে

পটাশ মিশ্রিত পানি

কারিগরি নোট

জীব নিরাপত্তা

মুরগি খামারে রোগ উৎপাদনকারী জীবানু বা অন্যান্য উপাদান যাতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থাকে জৈব নিরাপত্তা বলে। প্রতিটি বাড়িতে /খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দরকার অন্যথায় কৃষকের অনেক ক্ষতি সাধন হয়ে যাবে।

জীব নিরাপত্তার জন্য ৩টি প্রধান বিষয়কে বিবেচনায় আনা উচিত;

- সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে অন্তকরন (Isolation)
- লোকজন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা (Traffic Control)
- নিয়মিত মুরগির ঘর ও অন্যান্য খামারের উপকরণ জীবানুমুক্তকরন (Sanitation)

মুরগির ক্ষেত্রে সংক্রামক রোগের অন্তকরন (Isolation) এবং লোকজন চলাচল নিয়ন্ত্রণ যদি সঠিকভাবে করা যায় তবে অনেক ঝুঁকি থেকে মুরগির খামারকে রক্ষা করা যায় তবে খামারে নিয়মিত জীবানু মুক্তকরণ ও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

খামারে জীবানুমুক্তকরণ বিষয়টি যদি কৃষক গুরুত্ব দেয় এবং সে অনুযায়ী কাজ করে তাহলে উপকরণের জীবানু প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে। খামারে কৃষকের বাড়িতে যিনি খাবার ব্যবস্থাপনার কাজে যুক্ত থাকবে তাকেও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে সচেতনত হতে হবে। যেসব উপাদানগুলো দ্বারা রোগ ছড়াতে পারে সেগুলোকে যথাযত ব্যবস্থাপনার আওতায় আনতে হবে। যেমন মৃত মুরগি অপসারন, জীবানুবহনকারী পাখি, অসুস্থ মুরগি ব্যবস্থাপনা, নোংরা দূষিত খামার উপকরন, দূষিত কাপড় ছোপড়, জুতা, খাদ্য, খাদ্য বস্তা, মাটি ও পুরাতন লিটার ইত্যাদি।

খামারের যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম সংরক্ষণ ও ব্যবহার

- ব্যবহারের পূর্বে ও পরে খামারের সরঞ্জামাদী ধুয়ে ও জীবানুমুক্ত করতে হবে
- বাড়ন্ত ও বয়স্ক মুরগিকে আলাদা করতে হবে

খামারে কাজ শুরু করতে হবে প্রথমে বাড়ন্ত মুরগিতে এবং পরে বয়স্ক মুরগিতে। বাড়তি/খামারে যে সব মুরগি নতুন আসবে তাদেরকে কিছুদিন আলাদাভাবে রাখতে হবে এবং শেষে তাদের সাথে কাজ করতে হবে।

অন্যানী প্রাণি

সালমোনেলা জীবানু বহন করতে পারে এমন সব উপাদান থেকে খামারকে মুক্ত রাখা যেমন- খামারের আশে পাশে ময়লা আবর্জনা ফেলা যাবে না, ইঁদুরের প্রার্দুভাব থেকে রক্ষা করার জন্য খোলা জায়গা পরিহার করতে হবে।

বন্যপ্রাণি

সালমোনিলা ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস বহন করতে পারে। মুক্ত জলাশয়, বন্যজলচর পাখি যা সংস্পর্শে আসলে বার্ড ফ্লু ভাইরাস দ্বারা পুকুরের পানি আক্রান্ত হতে পারে।

পোকা-মাকড়: বিভিন্ন রকমের মাছি, মশা এক বাড়ি/খামার থেকে অন্য খামারে রোগ জীবানু ছড়াতে পারে।

অন্যান্য প্রাণির সংস্পর্শ যেমন- ইঁদুর, পোকা-মাকড় ও বন্যপ্রাণি

রোগ তৈরিকারী উপাদান

- ব্যাকটেরিয়া - সালমোনিলা পাস্টুরেলা
- ভাইরাস - নিউক্যাসেল ডিজিস ভাইরাস, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা
- ফাংগাস - এ্যাসপারগিলাস
- পরজীবি - কক্সিডিয়া

যে সব উপাদান খামারে রোগ পরিবহনে দায়ী

- মানুষ
- উপকরণ
- খামারে বা বাড়িতে নতুন মুরগির আগমন
- অন্যান্য প্রাণি বন্যপ্রাণি, ইঁদুর, পোকা-মাকড় ইত্যাদি
- খাদ্য/প্রাণি

কিভাবে এসব উপাদান থেকে মুরগিকে রক্ষা করা যায়;

- মানুষ: বাড়িতে/খামারে যেখানে মুরগি পালন করা হয় সেখানে মানুষের গতি নিয়ন্ত্রন করতে হবে। প্রয়োজন
- হলে তোরণ দেওয়া , তোরণে তালা দিয়ে রাখা ইত্যাদি।
- মুরগির খামারে কাজ করার পূর্বে ও পরে ভাল করে হাত-পা ধুয়ে নিতে হবে
- অবশ্যই পরিষ্কার/আলাদা জুতা পরে খামারে প্রবেশ করতে হবে।

খাদ্য : গুনগত মানের খাদ্য খাওয়াতে হবে এবং উঁচু এবং শুকনা স্থানে রাখতে হবে যাতে ছত্রাকের আক্রমন হতে না পারে।

পানি : ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য পানির পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবানুমুক্ত রাখতে হবে

- পুকুরের পানি পরিহার করতে হবে। কারণ এতে বার্ড-ফ্লু রোগের আক্রমন হতে পারে।
- পোষা প্রাণি/বন্য প্রাণি যাতে খামাওে ঢুকতে না পাওে সেদিকে নজর রাখতে হবে। কারণ তাদের মুখে
- পরিবাহিত জীবানু খামারকে আক্রমণ করতে পারে।

মোরগ-মুরগির টিকাদান কর্মসূচি

মোরগ-মুরগি :

রোগের নাম	টিকার নাম	বয়স	মিশ্রন প্রনালী পদ্ধতি	টিকা প্রয়োগের স্থান	ডোজ/মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
রানীক্ষেত	মুরগীর বাচ্চার রানী ক্ষেত (বিসিআরডিভি)	৪-৭ দিন ২১দিন	৬ সিসি ডিস্টিল্ড ওয়াটার মিশাতে হবে	চোখ	১০০ মুরগির বাচ্চা	১ চোখে ১ ফোটা
গুটিবসন্ত	পিজিয়ন পক্স	৩-৭ দিন	৩ সিসি ডিস্টিল ওয়াটার মিশাতে হবে	ডানার নীচে পালকবিহীন জায়গায়	২০০ বাচ্চাকে দেওয়া যায়	দুই সুই দিয়ে খুচিয়ে দিতে হবে
গুটি বসন্ত	ফাউল পক্স	২৮-৩১ দিন বয়সে দিতে হবে	৩ সিসি ডিস্টিল ওয়াটার মিশাতে হবে	ডানার নীচে পালকবিহীন জায়গায়	২০০ বাচ্চাকে দেওয়া যায়	দুই সুই দিয়ে খুচিয়ে দিতে হবে
রানীক্ষেত	বড় মুরগীর রানী ক্ষেত (আরডিভি)	২-২.৫ মাস বয়সে ১ম বার। ৪মাস পরপর মুরগীর জীবনকাল পর্যন্ত দিতে	১০০সিসি ডিস্টিল ওয়াটার মিশাতে হবে	রানের মাংসে	১০০ মুরগীকে দেওয়া যায়	১ সিসি করে ইনজেকশন রানও মাংসে দিতে হবে।
ফাউল কলেরা	ফাউল কলেরা	৭৫-৯০দিন, ৬ মাস পরপর দিতে হবে	ডিস্টিল ওয়াটার মেশানো লাগবে না	রানের মাংসে	১০০ মি.লি.	১ সি.সি. করে রানের মাংসে

হাঁস

রোগের নাম	টিকার নাম	বয়স	মিশ্রন প্রনালী পদ্ধতি	টিকা প্রয়োগ স্থান	ডোজ/মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি
ডাক প্লেগ	ডাক প্লেগ টিকা	২০-২৫ দিন বয়সে	১০০ সিসি ডিস্টিল ওয়াটার	রানের মাংসে	১০০ সিসি	১সিসি করে রানের মাংসে দিতে হবে
	ডাক প্লেগ টিকা	১ম মাত্রার ১৫দিন পর	১০০ সিসি ডিস্টিল ওয়াটার	রানের মাংসে	১০০ সিসি	
ডাক কলেরা	ডাক কলেরা টিকা	৬০ দিন পর	ডিস্টিল ওয়াটার মেশানোর প্রয়েঅজন নেই	রানের মাংসে	১০০ সিসি	

কবুতর পালন
পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিপুল জনগোষ্ঠির একটি উন্নয়নশীল দেশ। আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টিহীনতা নিরসনকল্পে কবুতর পালন হয়ে উঠতে পারে একটি উযোগ্য খাত। এমন কি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে এদেশের গরীব, অল্প আয়ের লোক, বেকার, শিক্ষিত ও অর্ধ শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্যে একটি সহজ উপায় হলো কবুতর পালন। পৃথিবীর বহু দেশেই কবুতর পালন একটি লাভজনক শিল্প হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

উদ্দেশ্য

- কবুতর এর বাসস্থান ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
- কবুতর পালনে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমাপর্কে ধারণা লাভ করবে
- কবুতর এর বিভিন্ন রোগ বালাই সম্পর্কে জানতে পারবে

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, বিভিন্ন খাদ্য উপাদান, কৃমির ঔষধের নমুনা ইত্যাদি।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরনের ব্যবহার

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে কবুতর পালন নিয়ে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

কবুতর পালন কেন করা হয় ?

- কবুতর পালনে কেমন ঘর প্রয়োজন?
- কবুতরের জাতকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা যায় ?
- কবুতর ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ কি কি ?
- কবুতরের খাদ্য কি কি ? এগুলো কোথায় পাওয়া যায় ?
- কবুতর পরিবহন এর সময় কি কি সতর্কতা মানতে হয় ?
- কবুতরের প্রজনন ব্যবস্থাপনা কি ?
- একটি কবুতর বছরে কয় বার ডিম পাড়ে ?
- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন খামার ব্যবস্থাপনা এর মধ্যে প্রার্থক্য কি কি ?
- স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা করতে হলে কি কি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে ?
- কবুতরের কি কি রোগ হয় ?
- কবুতরের টিকা গুলা কি কি ?

- প্রাপ্তবয়স্ক একটি কবুতর রাখার জন্য কতটুকু জায়গা দিতে হবে?
- একটি আদর্শ কবুতরের ঘর কেমন হওয়া উচিৎ?
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন।
- ম্যানিলা পেপারে একটি আদর্শ ঘরের নকশা উপস্থাপন করে এবং ঘরের মাপ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিন।
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন এবং কবুতর পালন করতে উদ্বুদ্ধকরুন ।

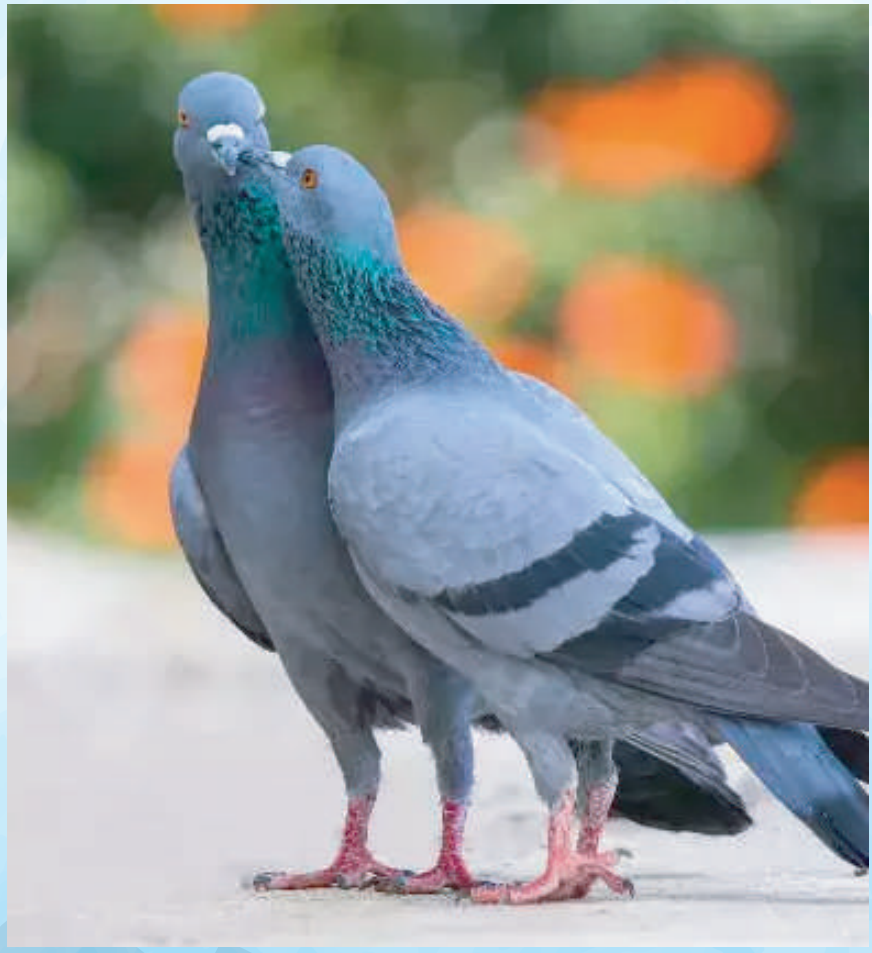

কারিগরী নোট

ভূমিকা

আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র বিমোচন ও পুষ্টিহীনতা নিরসনকল্পে কবুতর পালন হতে পারে একটি উযোগ্য খাত। এমন কি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নেও যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। তাই চন অঞ্চলের মানুষের পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণ, বাড়তি আয়ের সুযোগ হিসাবে কবুতর পালন খুবই গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা রাখাবে।

কবুতরের বর্ণনা

বাংলাদেশে কবুতরকে সাধারণত- অনেক নামে ডাকে যেমন- পায়রা, কইতর, কপোত, খেচর, গৃহরাজ, শান্তির দূত ইত্যাদি।

গৃহপালিত কবুতর মুলত ঃ Rock কবুতর হতে সৃষ্টি হয়েছে। এ সব কবুতর সাধারণত ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা এবং এশিয়াতে দেখা যায়, তারা বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। নযেমন- সাদা তামাটে বর্ণ, নকশা যুক্ত অথবা বিভিন্ন বর্ণের মিশ্রণে হয়ে থাকে। বেশীর ভাগ কবুতর অনেকটা হালকা শরীর এবং ঠোঁট মোটা। গৃহপালিত কবুতর সাধারণত উঁচু স্থানে বসবাস করে। কবুতর উঁচু পাহাড়ের কিনারা, দেওয়ালের তাক এবং ফাঁকা জায়গায় বসবাস করে। Feral কবুতরকে শহরের কবুতর (City pigeon) বলা হয় যা গৃহপালিত কবুতর হতে উৎপত্তি হয়েছে। কবুতরের দেহের

কবুতর পালনের সুবিধা সমূহ

কবুতর পালনের বিভিন্ন ধরনের উপকারিতা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কবুতর পালন করার পেছনে কারণ হলো এর উপকারিতা। কম খরচে মাংসের তাৎক্ষনিক যোগানের জন্য কবুতরের উপর অনায়াসে নির্ভর করা চলে। কবুতর পালনের উল্লেযোগ্য সুবিধা সমূহ হচ্ছেঃ

- কবুতর সহজেই পোষ মানে। গৃহপালিত অন্যান্য পাখির মধ্যে কবুতরকে অনায়াসে পোষ মানানো বা লালন করা যায়।
- বিশ্বব্যাপী কবুতর শান্তির প্রতীক হিসেবে ব্যবহার। বাংলাদেশে কোন অনুষ্ঠান শুরুতে পূর্বে শান্তির প্রতীক
- হিসেবে কবুতর উড়ানো হয়।
- অল্প পুঁজি ও শ্রমে কবুতর পালন করে বেশ লাভবান হওয়া যায় এবং আর্থিক সংগতি বাড়ানো যায়।
- খুবই অল্প জায়গায় কবুতর লালন পালন করা যায়। বাড়ির আঙিনা বা বাসার ছাদে এমনকি ঝোলানো
- ঝুঁড়িতেও কবুতর পালন করা সম্ভব। কবুতরের ঘর খুব কম খরচেই তৈরি করা যায়।
- কবুতর পালনের জন্য মুরগীর তুলনায় ১/৩ ভাগ জায়গা প্রয়োজন হয়।
- ছয় মাস বয়স থেকেই কবুতর ডিম দিতে থাকে। সাধারণত একটি ভাল জাতের কবুতর বছরে ১২ জোড়া ডিম
- প্রদানে সক্ষম হয়ে থাকে।
- এক জোড়া কবুতর হতে প্রতিমাসে গড়ে দুইটি বাচ্চা পাওয়া যায়।

- কবুতরের প্রজনন পদ্ধতি ফোস্টার-এর মাধ্যমে করলে এক জোড়া কবুতর থেকে বছরে ২৫ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়।
- ১৮ দিনে কবুতরের ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই কবুতরের বাচ্চা খাবার উপযোগী হয়।
- কবুতরের মাংস খুব সুস্বাদু এবং পুষ্টিকর। কবুতরের মাংসে প্রচুর খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন থাকায় অসুস্থ ও
- বাচ্চাদের জন্য একটি খুবই পুষ্টিকর এবং সহজ পাচ্য খাদ্য।
- কবুতরের খাদ্য খরচ খুবই কম। অনেক ক্ষেত্রে এরা নিজেরাই খাবার সংগ্রহ করতে পারে।
- কবুতরের রোগ বালাই তুলনামুলকভাবে কম। সামান্য কিছু নিয়ম কানুন ও পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করলে খুব
- সহজেই এদের রোগ বালাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।
- কবুতর পোকা মাকড় ধ্বংস করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করে।
- কবুতরের পালক বিভিন্ন খেলার সামগ্রী তৈরীতে কাজে লাগে।
- কবুতর পালন করে আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণসহ কর্মসংস্থান, বেকারসমস্যা ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করে।
- কবুতর পালন আনন্দদায়ক। ছোট ছেলে-মেয়ে থেকে সব বয়সের মানুষই এদের পালন করতে পারে।
- ধারাবাহিকভাবে কবুতর তার বংশবৃদ্ধি করে বলে অনেকেই আজকাল কবুতর পালনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। মুরগির মাংসের বিকল্প হিসেবে কিংবা অতিথি পাখির বিকল্প হিসেবে অনেকেই কবুতরের মাংস বেছে নিয়ে থাকেন।
- কবুতর বাসা বাড়ী ও প্রকৃতির শোভাবর্ধন করে এবং আনন্দ প্রদান করে।
- বিভিন্ন কবুতর বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। কবুতর উড়ানোর প্রতিযোগিতার জন্য ব্যবহার হয়।
- কবুতর পোল্ট্রির মধ্যে সবচেয়ে দামী পাখি বর্তমানে। কারণ, এক জোড়া ফেন্সী কবুতর কমপক্ষে ৫-৩০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়। এমনকি এক জোড়া কবুতর বাংলাদেশে ৫ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হওয়ার তথ্য রয়েছে।
- কবুতর বাণিজ্যিকভাবে লালন পালন করে শিক্ষিত, আধা-শিক্ষিত, বেকার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান ও অর্থ উপার্জনে একটি ভাল মাধ্যম।

কবুতর পালন পদ্ধতি ও খামার ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন ধরণের গৃহপালিত পাখির মধ্যে কবুতর সর্বাধিক জনপ্রিয়। কবুতরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যগত দিকগুলোর কারণেই মুলতঃ কবুতর পালন করা হয়ে থাকে। এছাড়াও কবুতরের মাংস অত্যান্ত সুস্বাদু দীর্ঘদিন ধরে পোল্ট্রির পাশপাশি কবুতর পালন করে আসছে নানাবিধ কারণে। সম্প্রতি বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করে অনেকেই অল্প সময়ে লাভজনক শিল্প হিসেবে এদেশের মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাই, আজ বিত্তবান, শিক্ষিত ও বেকার ব্যক্তিগণ আধুনিক উপায়ে বাড়ি ঘরে/ দালান কোঠায় রং-বেরঙ্গের কবুতরের খামার চোখে পড়ে। শহরে শখের বসে ২-৪টা করে বিদেশী বিভিন্ন জাতের কবুতর পালন শুরুটা হয়েছিল কিন্তু আজকাল অর্থনৈতিক লাভের আশায় বেশ বড় করে কবুতরের খামার শুর করেছে। পাশাপাশি সুস্বাদু মাংস ও পুষ্টিগুণ এবং লাভজনক হওয়ায় দেশীয় কবুতরের খামার বৃদ্ধি পেয়েছে। লাভজনক ও টেকসই কবুতর খামার স্থাপনের জন্য প্রয়োজন মুলধন, পরিকল্পনা, কবুতরের জাত, কবুতরের বাসস্থান, সুলভে খাদ্য সরবরাহ, লাভজনকভাবে উৎপাদিত পণ্য যেমন- বাচ্চা ও ডিম বাজারজাতকরণ, রোগ-ব্যাধি দমন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন শহর ও শহরতলী বিভিন্ন উন্নত জাতের বেসরকারী কবুতরের খামার গড়ে উঠেছে। এ সকল খামারে পৃথিবীর বিখ্যাত জাতের কবুতর পালন করা হয়ে থাকে। লাভজনক ও টেকসই কবুতর খামার স্থাপনের জন্য যে সব বিষয় জানা দরকার তা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

কবুতর পালনের প্রয়োজনীয় তথ্য

কবুতরের দৈহিক ওজন (জাতভেদে)	২৫০-৯০০গ্রাম
প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সময়কাল	৫-৬ মাস
কবুতর কয়টি ডিম দেয় (স্বাভাবিক)	২টি
বছরে গড়ে বাচ্চা উৎপাদন	১০.৪৩ জোড়া
হ্যাচাবিলিটি/ডিম ফোটার হার	৮৮.৫৪%
বাচ্চা উৎপাদনের বয়সকাল	৪-৬ মাস
বাচ্চা ফুটার জন্য ডিম তা দেওয়া	১৭-১৯ দিন
বাচ্চার চোখ ফোটে	৪-৫ দিন পর
পালক গজানোর সময়কাল	১০-১২ দিন
মাংস হিসেবে খাওয়ার উপযোগী	২০-৩০ দিন
পাখা ও পা শক্ত হয়	১৯-২০ দিন
বাচ্চা পিজিয়ন মিল্ক কত দিন খায়	১০দিন
বাচ্চা উড়তে শিখতে সময় লাগে	৪০-৪৫দিন
দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা	১০৭.৬ ফারেনহাইট
হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে	১২৮-১৪০ বার
কবুতরের জীবনকাল	১৫-২০ বছর

কবুতরের খামার স্থাপনের পরিকল্পনা

কবুতরের খামার স্থাপনের মুল উদ্দেশ্য হলো আর্থিকভাবে লাভবান হওয়া। মনে রাখতে হবে সুষ্ঠু পরিকল্পনাই খামারের মুল চাবিকাঠি। সুষ্ঠু প্রকল্প, পরিকল্পনা ও মূলধন; কবুতর পালন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ; কবুতর সংগ্রহের জন্য বিশ্বস্থ ব্রিডার; প্রাথমিক মুলধন বিনিয়োগের খাত; খামারের জায়গা, নির্মাণ সামগ্রী এবং কবুতর ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয়, রাস্তাঘাট ও পানির ব্যবস্থা করা; দৈনন্দিন খরচ, কবুতরের খাদ্য, যাতায়াত খরচ, বিদ্যুৎ খরচ, শ্রমিক মজুরী, যন্ত্রপাতি মেরামত, ঐষধপত্র ও টিকা দেওয়ার খরচ ইত্যাদি।

কবুতর প্রাপ্তির স্থান

কবুতর বাংলাদেশের সর্বত্র পালন হয়ে থাকে এবং পাওয়া যায়। তবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে কবুতর পালন করছে। বিভিন্ন শৌখিন ব্যক্তি নিজ চেষ্টায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী জাতের কুবতর লালন পালন শুরু করছে এবং আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে বেশী দামে বিক্রয় করে থাকে। অর্থনৈতিকভাবে লালন পালনের জন্য বাংলাদেশে যে সব অঞ্চলে উন্নত/ শৌখিনজাতের কবুতর পাওয়া যায় সেই অঞ্চলগুলো হলো- ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ঝিনাইদাহ, যশোর, পটুয়াখালী, বরগুনা, নাটোর, ময়মনসিংহ, বান্দরবান ও কক্সবাজার ইত্যাদি। আবার বিভিন্ন জাতের কবুতরের মার্কেটেও বেড়ে উঠেছে। সেসব মার্কেটে উন্নত জাতের কবুতর পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঢাকার কাটাবন, মিরপুর-১১, জিঞ্জিরা, টঙ্গি, গাজীপুর, ঠাটারী বাজার ঢাকা, পাবনার বাইপাসহাট, নাটোরের তেবাড়িয়াহাট, রাজশাহীর বানেশ্বরহাট, কেশরহাট, কাঁটাখালীহাট এবং বিভিন্ন জেলার শহরাঞ্চলের পোষা প্রাণি সৌখিন মার্কেট ইত্যাদি।

কবুতরের জাত নির্বাচন

মানুষের প্রয়োজনে কবুতরকে বিভিন্নভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্য নতুন নতুন জাত (breed) এর সৃষ্টি করা হয়েছে। এক জাতের কবুতর অন্য জাতের কবুতর হতে বৈশিষ্ট্যর দিক থেকে পৃথক। বিশ্বে এ পর্যন্ত ৩৫০ জাতের কবুতর পাওয়ার তথ্য রয়েছে তবে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৯৯ টি জাতের কবুতরের তথ্য আছে। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে কবুতরের জাতকে মোট ৪ ভাগে বাগ করা যায় যথা:

১। **শোভাবর্ধনকারী জাত :** প্রাকৃতির সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও বিনোদনের জন্য এ জাতের কবুতর পালন করা হয় যেমন- কি, পোটার, ক্রপার, জ্যাকোপিন, ফ্রিলব্যাক, হোমার, রান্ট, ফ্যানটেল ইত্যাদি।

২। **রেসিং জাতের কবুতর :** এ জাতের কবুতর সাধারণত কত বেগে উড়তে পারে এবং নিদির্ষ্ট স্থান থেকে আবার নিজ বা স্থানে ফেরত আসতে পারে। যেমন: রেসিং হোমার, হর্সম্যান ইত্যাদি।

৩। **ফাইং জাতের কবুতর :** বাহিংহাম রোলার, ফাইং টিপলার/ফাইং হোমার, হাম্বলার, কিউমুলেট ইত্যাদি।

৪। **মাংস উৎপাদনকারী জাত :** মাংসের জন্য অর্থ্যাৎ স্কোয়ার (Squab)/কবুতরের বাচ্চা উৎপাদনের জন্য এ জাতের কবুতর পালন করা হয় যেমন- দেশী জাতের কবুতর- সিরাজী, জালালী, গিরিবাজ, লোটন, বোম্বাই, গোলা, গোবিন্দ, ইত্যাদি।

উৎপত্তি হিসেবে কবুতরের জাত (Breeds on origin basis) দু ই প্রকার যর্থা:

১। **দেশী জাত (Local breed) :** বাংলাদেশে প্রাপ্ত নিজস্ব জাতের কবুতরকেই মূলত দেশী জাত বলা হয়। এরা বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে। এদের মধ্যে আছে সিরাজী, জালালী, গিরিবাজ, লোটন, বোম্বাই, বাংলা, গোবিন্দ, ইত্যাদি।

২। বিদেশী জাতের কবুতর (Foriegn breed) : বাংলদেশ ও বিদেশী জাতের কবুতর পাওয়া যেমন : সাদা, কালো, সিলভার, হলুদ, ও নীল, র্কানেইউ, সুইচ মন্ডেইন, অ্যামিরিক্যান জায়েন্ট হোমার, রান্ট ইত্যাদি।

বাণিজ্যিক কবুতর খামারীরা যেসব কবুতর পালন করে সেসব নিম্নে টেবিলে দেয়া হলো :

• হেনা পোটার (Hena Pouter)	• হোমার (Homer)
• রেইন (Rain)	• কিং (King)
• স্ট্রেচার (Strasser)	• মন্ডিয়ান (Mondain)
• জার্মান ক্রোপার (German Cropper)	• ঘিয়া চন্দন (Gheya Chandon)
• বুখারা (Bukhara)	• সোয়া চন্দন (Suachandan)
• সর্ট পিস (Short Piece)	• মুক্ষি (Mookee)
• ফ্রিলব্যাক (Frill Back)	• সিরাজি (Sirajee)
• জ্যাকোবিন (Jakobin)	• মালটেজ (Maltese)
• আর্চএঞ্জেল (Archangle)	• লাক্ষা (Lakkah)

কবুতর ক্রয়ের সময় বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন, চঞ্চল, সজীব কবুতর কিনতে হবে।
- পালক এবং মলদ্বার পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হতে হবে।
- ঠোঁট বা মুখ দিয়ে লালা বা মিউকাস পড়বে না।
- যে কোন ধরণের আঘাতমুক্ত হতে হবে।
- জোড় হিসেবে কবুতর কিনতে হবে।
- রোগমুক্ত বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিন দেয়ার তথ্য নিতে হবে।
- কি ধরণের খাবার খাওয়ার অভ্যাস তা জেনে নিতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ পর্যবেক্ষণসহ কবুতরগুলোকে কখন কোন রোগের ভ্যাকসিন/টিকা এবং কৃমিনাশক ঔষধ প্রয়োগের বিস্ড়ারিত তথ্য জেনে নিতে হবে।

কবুতর পালন পদ্ধতি

সাধারণত উদ্দেশ্য ও বাসস্থানের উপর ভিত্তি করে কবুতরের পালন পদ্ধতিও বিভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। যেমন-

প্রচলিত পদ্ধতি

প্রচলিত পদ্ধতিতে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত পদ্ধতি কবুতর পালন হয়ে আসছে। আমাদের দেশের লোকেরা সাধারণত এ পদ্ধতিতে বেশী সংখ্যক কবুতর পালন করে থাকে। এই পদ্ধতিতে মাংস উৎপাদন ও চিত্তবিনোদনের

জন্য দেশীয় জাতের কবুতর পালন করা হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট কোন জায়গার প্রয়োজন হয় না। বাড়ির আঙিনা থেকে শুরু করে ছাদের নিচের কার্নিশ, বাড়ীর ছাদ, ঘরের দেওয়ালে, মাটির হাড়ি, টিন বেধে রেখে, বাড়ির পার্শ্বে ফাঁকা স্থানে ঘর বানিয়ে দিলেই চলে। যে কেহ নিকটস্থ হাট/বাজার থেকে ২-৪ জোড়া অল্প বয়স্ক কবুতর এনে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে কয়েকদিন খাবার দিয়ে খুব সহজেই উলেখিত স্থানের ঘরে পোষ মানে এবং প্রতিমাসে ১ জোড়া বাচ্চা দিয়ে থাকে। শুধু খেয়াল রাখতে হয় তার ঘরে যেন বিড়াল, বনবিড়াল, গাওড়, শেয়াল, ইদুর ইত্যাদি ক্ষতিকারক প্রাণিগুলো ঢুকতে না পারে। এই পদ্ধতিতে সচরাচর বাঁশ, কাঠ, টিন বা মাটির পাত্র দিয়ে কবুতরের বাসস্থান তৈরি করা হয়। যেমন বাঁশের খাঁচা বা টংগ, কাঠের বাক্স বা খাঁচা বা খোপ, মাটির খোলা বা হাড়ি ইত্যাদি। প্রতি জোড়া কবুতর এসব খোলা বাড়িতে বসবাস শুরু করে এবং ডিম পাড়ে ও বাচ্চা ফুটায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে কবুতর প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে। এর ফলে খামারীদের অতিরিক্ত কোন খাবার দিতে হয় না।

বাণিজ্যিক পদ্ধতি

বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জি.আই পাইপ, রড, নেট ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে খাঁচা তৈরি এবং তা ছাদের বা বহুতল বিশিষ্ট বাড়িতে স্থাপন করে কবুতরের আধুনিক বাসস্থান নির্মাণ করা হয়। আধুনিক পদ্ধতিতে প্রতিজোড়া মাঝারী ও ভারী জাতের কবুতরের জন্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ উচ্চতা যথাক্রমে ২৪x২৪x২২ইঞ্চি বিশিষ্ট খাঁচা তৈরি করা হয়। সারিতে ৬-৮টি কবুতরের খোপ থাকে। প্রতি তলায় খাঁচার নিচে মল সংগ্রহের ট্রে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

কবুতরের খাদ্য

বাণিজ্যিকভাবে গড়ে উঠা বিভিন্ন খামারের কবুতরকে শস্য দানা ও মিনারেল মিশ্রণ নিয়মিত খাবার দেওয়া হয়। প্রতিটি পূর্ণ বয়স্ক কবুতরকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় শস্য দানা ৪৫-৫০ গ্রাম এবং মিনারেল মিশ্রণ ৫-৭ গ্রাম দেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রজননক্ষম কবুতরকে প্রতিদিন শস্যদানা ও মিনারেল মিশ্রণ মিলে মোট প্রায় ৫০-৫৫ গ্রাম খাবার দেওয়া হয়। শস্যদানার উপাদানগুলো হলো- গম, ভুট্টা, কাউন, কালাই, সরিষা, অঙ্কুরিত ছোলা ও লিনটিন জাতীয় শস্য। এই সব খাদ্য মিশ্রণে প্রতি কেজিতে ২৯০০-৩০০০ কিলোক্যালরী মেটাবলিক এনার্জি এবং ১৪-১৬% ক্রুড প্রোটিন থাকতে হয়। মিনারেল দ্রবণ পর্যাপ্ত পরিমানে খাওয়ার ফলে ডিমের খোসার গুণাগুণ ভাল হয়।

বাচ্চা কবুতরের খাদ্য

ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার কমপক্ষে ৪-৫ দিন পর কবুতরের বাচ্চার চোখ ফুটে। এজন্য এ সময়ে বাচ্চাগুলো কোনো দানাদার খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না। এ সময় স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর তাদের ক্রপ থেকে ঘন ক্রিম বা দধির মত নিঃসরণ করে যাকে কবুতরের দুধ (Pigeon milk) বলে। এ দুধ অধিক আমিষ, চর্বি এবং খনিজ লবণ সমৃদ্ধ যা খেয়ে কবুতরের বাচ্চা বড় হয় এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত খেতে পারে। বাচ্চাগুলো যখন বড় হতে থাকে তখন স্ত্রী এবং পুরুষ কবুতর উভয়ে দানাদার খাদ্যের সাথে দুধ মিশিয়ে ঠোঁট দিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। বাচ্চা বড় হয়ে নিজে খাদ্য গ্রহণ না করা পর্যন্ত এভাবে খাবার খাওয়াতে থাকে।

প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের খাদ্য

কবুতরের জন্য তৈরিকৃত খাদ্য শর্করা, আমিষ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, চর্বি এবং খনিজ লবণ সম্পন্ন সুষম খাদ্য হতে হবে। কবুতর দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে, ম্যাশ বা পাউডার জাতীয় খাদ্য অপছন্দ করে। ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০-৩০ গ্রাম, মাঝারি আকারের জন্য ৩৫-৫০গ্রাম এবং বড় আকারের জন্য ৫০-৬০গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। দানাদার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, গহমা, কাউন, চীনা হেটকা শতকরা ৬০ ভাগ এবং লেগুমিনাস বা ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা, খেসারি, মাসকলাই শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ সরবরাহ

করতে হবে। কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাকসবজি, কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।

প্রাপ্ত বয়স্ক কবুতরের খাদ্য

কবুতরের জন্য তৈরিকৃত খাদ্য শর্করা, আমিষ, খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন, চর্বি এবং খনিজ লবণ সম্পন্ন সুষম খাদ্য হতে হবে। কবুতর দানাদার জাতীয় খাদ্য বেশি পছন্দ করে, ম্যাশ বা পাউডার জাতীয় খাদ্য অপছন্দ করে। ছোট আকারের কবুতরের জন্য ২০-৩০ গ্রাম, মাঝারি আকারের জন্য ৩৫-৫০গ্রাম এবং বড় আকারের জন্য ৫০-৬০গ্রাম খাদ্য প্রতিদিন দিতে হবে। দানাদার জাতীয় খাদ্যের মধ্যে গম, ধান, ভুট্টা, গহমা, কাউন, চীনা হেটকা শতকরা ৬০ ভাগ এবং লেগুমিনাস বা ডাল জাতীয় খাদ্যের মধ্যে সরিষা, খেসারি, মাসকলাই শতকরা ৩০-৩৫ ভাগ সরবরাহ করতে হবে। কবুতরের ভিটামিন সরবরাহের জন্য বাজারে প্রাপ্ত ভিটামিন ছাড়া সবুজ শাকসবজি, কচি ঘাস সরবরাহ করা প্রয়োজন।

প্রতিদিন ২ বার খাদ্য সরবরাহ করা ভালো। মাঝে মাঝে পাথর, ইটের কণা (গ্রিট) এবং কাঁচা হলুদের টুকরা দেয়া উচিত। কারণ, এ গ্রিট পাকস্থলীতে খাবার ভাঙ্গতে এবং হলুদ পাকস্থলী পরিষ্কার বা জীবাণুমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া কবুতরের প্রজননের সময় বা ডিম দেয়ার সময় গ্রিট মিশ্রণ বা খনিজ মিশ্রণ, ডিম এবং ডিমের খোসা তৈরি এবং ভালো হ্যাচাবিলিটির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়।

বাণিজ্যিক কবুতরের খামারে অনুপাত অনুসারে খাদ্য উপাদানের কয়েকটি নমুনা তালিকা দেওয়া হলো।

নমুনা ঃ ১ ঃ শতকরা হারে খাদ্য উপাদানের পরিমান।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (%)
গম	৪০
ভুট্টা	১৫
ডাবলি	৮
হেটকা	৮
মটর	৮
মগুর	৮
চিনা	৮
কুসুমফুল বীজ	৫
মোট-	১০০%

নমুনা ঃ ২ ঃ ১০ কেজি পরিমান খাবারের রেশন ফরমুলা।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (%)
গম	৫
ভুট্টা	২
ডাবলি	০.৫
হেটকা	১.৫
মগুর	০.২৫
চিনা	০.৫০
কুসুমফুল বীজ	০.২৫
মোট-	১০ কেজি।

বাণিজ্যিক কবুতর খামারী উপরিবর্ণিত খাদ্য তালিকার যে কোন একটি অনুসরণ করে কবুতরের খাবার তৈরি করতে পারেন। উপাদানগুলো কম-বেশি হলে তেমন সমস্যা নেই। তবে এ ধরণের উপাদান কবুতর পছন্দ করে এবং এতে কবুতর সুস্থ্যসহ উৎপাদন ভাল হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

পানি সরবরাহ

প্রতিদিন পানির পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করে কবুতরকে দিনে ৩বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা উচিত। কবুতর যেহেতু ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে ঢোক গেলার মাধ্যমে পানি পান করে সেহেতু পানির পাত্র গভীর বা খাদ জাতীয় হওয়া উচিত। এক সপ্তাহ পর পর পটাশ মিশ্রিত পানি সরবরাহ করলে পাকস্থলী বিভিন্ন জীবাণুর আক্রমন থেকে রক্ষা পাবে। প্রতিদিন প্রতিটি কবুতরের জন্য প্রায় ১০০ মিলি পরিষ্কার পানি লাগে।

কবুতর পরিবহন

কবুতর ক্রয় করার পর স্বাস্থ্যসম্মতভাবে নিজ খামারে আনতে হবে। কোনক্রমেই যেন কবুতরের উপর ধকল না পড়ে সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কবুতরকে পরিবহনের জন্য প্রতি জোড়া ২x২x২ পরিমান কাটুন, বাক্স বা ঝুঁড়ির প্রয়োজন হবে। সবগুলোতে আলো-বাতাসের জন্য ছিদ্র বা ফাঁক থাকতে হবে যেন অক্সিজেনের অভাবে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা না যায়। বাক্সটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে এজন্য আনা নেওয়ার ৩-৪ দিন ভাইরোসিড/ ভিরকন/ ফার্ম-৩০/ বায়োডিন/ পভিসেভ ইত্যাদির যে কোন একটি জীবাণুনাশক ঔষধের পানি দিয়ে ধৌত করে এটি ব্যবহার করতে হবে। বাক্সটি হাতে করে রিক্সা, ভ্যান, মটর, গাড়ী, স্টিমার, ট্রেন, বাস, ট্র্যাক ইত্যাদিতে পরিবহন করা যাবে। পরিবহনের সময় বাক্স কোনক্রমে জোরে নাড়াচাড়া করা যাবে না।

কবুতরের প্রজনন ব্যবস্থাপনা

বাণিজ্যিক ভাবে কবুতরের খামারীগণ সাধারণত উন্নত জাতের কবুতর যেমন- কিং, পোটার, জ্যাকোবিন, রান্ট, স্ট্রেসার, মুক্ষী ইত্যাদির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ফোস্টার/ পালিত মা হিসেবে গিরিবাজ, হোমার, সিরাজি, গোলা, বোম্বে ইত্যাদি কবুতর পালন করে থাকেন। প্রায় সব জাতের কবুতর ৬-৮ মাসের বয়স হলে স্ত্রী কবুতর ডিম দেওয়া শুরু করে এবং বাচ্চা বড় হতে ৪০-৪৫ দিন সময় লেগে যায়। কোন কোন সময় কবুতর বাচ্চা লালন পালন করার পাশাপাশি পুনরায় ডিম দেওয়া শুরু করে দেয়। আবার বাচ্চা দ্রুত সরিয়ে নিলে তাড়াতাড়ি কবুতর ডিম দেওয়া শুরু করে। বাচ্চা সরিয়ে না নিলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা উড়তে শিকার পর ডিম দেয় এতে বছরে বাচ্চা পাওয়ার পরিমাণ কমে যায়। উন্নত জাতের কবুতর হতে বছরে গড়ে ৯-১০ জোড়া বাচ্চা পাওয়া যায়। উন্নত ও ভারীজাতের কবুতরের ব্রুডিং ক্ষমতা কিছুটা কম থাকায় ডিম ফোটানোর হার কিছুটা কম হয় এবং আবার বাচ্চা লালন পালনে কিছুটা উদাসীন। অপরদিকে দেশীয় জাতের কবুতর, হোমার, সিরাজী ইত্যাদির ডিমে তা দেওয়া ও বাচ্চা লালন পালনে খুব যত্নবান। তাই খামারীগণ কৌশলে উন্নত জাতের কবুতর যখন ডিম দেয় ঐ ডিমগুলো সরিয়ে নিয়ে ৪-৫দিনের জন্য পাস্টিক ডিম তাদের বাসা রাখে এবং উন্নত জাতের ডিমগুলো ফোস্টার/ পালিত মা কবুতরের যারা নাকি নিজেরাই ডিম দিয়ে ব্রুডিং কার্য চালাতে থাকে এমন সব কবুতরের ডিমগুলো সরিয়ে নিয়ে উন্নত জাতের কবুতরের ডিমগুলো

ব্রুডিং জন্য দেওয়া হয়। এবং ফোস্টার কবুতর নিজের ডিম মনে করেই তা দিয়ে থাকে এবং আপন গতিই বাচ্চা ফোটায় এবং পিজিয়ন মিল্ক পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ই কবুতর বাচ্চাদের খাওয়ান এবং বড় হওয়া পর্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে ঠোঁটের সাহায্যে বাচাকে খাওয়ায়ে বাচ্চাকে বড় করে তোলে। অপরপক্ষে, বিদেশী বা উন্নত জাতের কবুতরের বাসা থেকে ৪-৫দিন পর পাস্টিকের ডিম সরিয়ে নিলে ঐ কবুতর গুলো যদি সুষম খাবার পায় তাহলে ১০-১৫দিনের মধ্যে পুনরায় ডিম দেওয়া শুরু করে এবং খামারীগণ আবার পূর্বের ন্যায় ডিমগুলো অন্যান্য ব্রুডিং ফোস্টার কবুতরের মাধ্যমে উন্নত জাতের বাচ্চা উৎপাদন করতে থাকেন। এ পদ্ধতিতে খামারীগণ প্রতি জোড়া উন্নত জাতের কবুতর থেকে বছরে ১৯-২৪ জোড়া বাচ্চা পেয়ে থাকেন।

শীতকালীন খামার ব্যবস্থাপনা

শীতকালীন অত্যাধিক ঠান্ডা থেকে কবুতরকে রক্ষা করতে কবুতরের খামারে অধিক মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ঘরের মধ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার জন্য ১০০ওয়াট এর হলুদ বাতি প্রয়োজন অনুযাযী ২টি বা ৩টি করে ঝুলানো যেতে পারে। বাতি গুলো ছাদ থেকে নিচের দিকে অথবা খামারের সঙ্গে লম্বালম্বি তারের সাথে ৫ ফুট উচ্চতায় ঝুলিয়ে দিতে হবে। বাইরের ঠান্ডা বাতাস

গ্রীষ্মকালীন খামার ব্যবস্থাপনা

শীতকালের ন্যায় গ্রীষ্মকালেও অত্যাধিক গরম থেকে কবুতরকে রক্ষা করতে ঘরের ছাদে সিলিং ফ্যান এর ব্যবস্থা করতে হবে। ঘরের ভিতর যেন পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সে জন্য জানালার পর্দা সরিয়ে দিতে হবে। গরম বাতাস বের করার জন্য এক্সাস্ট ফ্যান ব্যবহার করতে হবে।

কবুতরের পায়ে ব্যান্ড বা রিং

কবুতরের খামারীরা তাদের কবুতর চিহ্নিত করার জন্য পায়ে ব্যান্ড পরিয়ে রাখে যাতে সহজেই নিজস্ব কবুতর চেনা যায়। ব্যান্ড দেখে কবুতর দেখে নির্ভুলভাবে জাতসহ বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায় যাতে কোন ফার্ম থেকে এবং কোন জাতের তা যিনি কবুতর ক্রয় করবেন তার জন্য খুবই সুবিধা হয়। কবুতরের ব্যান্ডকে অনেকে কবুতরের রিং ও বলে থাকেন। প্রতিটি কবুতরকে চিহ্নিত করার জন্য রিং পড়ানো হয়। কবুতরের রিং এর মাধ্যমে কোন ব্যান্ডের তা নির্দেশ করে। রিং গুলো যেভাবে লাগানো তা সহজেই খোলা যায় না যদি খুলতে হয় তবে পা ভেঙ্গে বের করতে হয়। রিং পড়ানো থাকলে কবুতরের জাত, বয়স, বাচ্চা উঠার তারিখ স্বাস্থ্যতথ্য, মালিক ও কবুতরের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকে। সৌখিন কবুতর মালিক কবুতরের জন্য বিভিন্ন ব্যান্ড ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন জাতের কবুতরের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যান্ড থাকে। তবে ব্যান্ডের সাইজ ঠিন না হলে পায়ে ক্ষত হয় এবং এক্ষেত্রে ব্যান্ড দ্রুত খুলে ফেলে পায়ে এন্টিবায়োটিক পাউডার লাগাতে হবে। ব্যান্ডটি বাচ্চা হওয়ার কিছুদিন পরই লাগাতে হয়।

স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা

খামার হতে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনা বা খামারের জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা খুবই গুরত্বপূর্ণ। কেননা বেশিরভাগ রোগই খামার ব্যবস্থাপনার সার্থে সম্পর্কযুক্ত। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খামার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলে একদিকে যেমন বিভিন্ন রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে অন্যদিকে তেমনি মানসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন হবে এবং অধিক লাভবান হওয়া যাবে। স্বাস্থ্যসম্মত খামার ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়গুলো নিম্নে তালিকাবদ্ধ করা হলো।

- সঠিকভাবে ঘর/খাঁচা তৈরি করতে হবে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ এবং বায়ু চলাচল করতে পারে।
- নির্দিষ্ট জাতের কবুতরের জন্য সঠিক মাপে খোপ তৈরি করতে হবে।
- কবুতর উঠানোর আগে খামারসহ ব্যবহার্য সকল যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রথমে পানি দিয়ে পরিষ্কার করার পর পানির সাথে কার্যকরি জীবাণুনাশক (যেমন-০.২-০.৫% সোডিয়াম হাইপোকোরাইড বা আয়োডিন দ্রবণ পরিসেপ কোম্পানি কর্তৃক নির্দেশ মোতাবেক) মিশিয়ে খামারের সকল অংশে স্প্রে করতে হবে।
- সুস্থ্য সবল কবুতর সংগ্রহ করতে হবে। প্রয়োজনে বাহ্যিক পরজীবি নিধনের জন্য ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবণে কবুতরকে গোসল করিয়ে নিতে হবে। এক্ষেত্রে কবুতরের মুখ এ দ্রবণে ডুবানো যাবে না। হাত দিয়ে মাথায় লাগিয়ে দিতে হবে। অন্তঃপর জীবি প্রতিরোধের জন্য কৃমিনাশক ঔষধ সেবন করাতে হবে।
- জীবাণুমুক্ত খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ করে খাবার যাতে কোন অবস্থাতেই অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত না হয়। অতিরিক্ত আর্দ্রতাযুক্ত খাবারের মাধ্যমে অ্যাসপারজিলোসিস ও বিষক্রিয়াসহ জটিল রোগ হতে পারে।
- কবুতরের খোপ, দানাদার খাদ্য ও খনিজ মিশ্রণ সরবরাহের পাত্র, পানির পাত্র ও গোসল করার পাত্র এবং কবুতর বসার স্ট্যান্ড নিয়মিত পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত করতে হবে।
- খামারে মানুষের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। প্রতিবার খামারে প্রবেশ করার পূর্বে এবং খামার থেকে বের হওয়ার সময় হাত ও পা অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আয়োডিন যৌগ (পভিসেপ) বা কার্যকর জীবাণুনাশক ব্যবহার করতে হবে।
- খামারে যাতে বন্য প্রাণী ও ইঁদুর জাতীয় প্রাণী প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা বন্য প্রাণী ও ইঁদুর দ্বারা রাণীক্ষেত, মাইকোপাজমা ও সালমোনেলাসহ গুরুত্বপূর্ণ রোগ খামারে আসতে পারে।
- খামারের ভেতরের মশা, মাছি খামারের ভেতর প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য নেটের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় মশা ও মাছির কামড়ে কবুতরের পক্স ও প্যাপিলোমাটোসিস রোগ হয়।
- কবুতরের খামার দিনে কমপক্ষে ২বার পর্যবেক্ষণ করতে হয়।
- কবুতর সাধারণত শস্য দানা ভোগী প্রাণী বিধায় তার খাবারে বিভিন্ন উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকা প্রয়োজন। এজন্য খাবারের দোকান থেকে অথবা বাসায় প্রস্তুতকৃত সুষম খাওয়ার খাওয়াতে হবে। একটি আদর্শ কবুতর কমপক্ষে ১২ থেকে ১৫% প্রোটিন থাকতে হবে।

- সচরাচর প্রচলিত খাদ্য উপাদানগুলো হলো গম, ভুট্টা, মটর, চীনা, কাউন, ধান, কসুমফুল বীজ, মশুর এমনকি বাদামী চাল। কবুতরকে ছোট ছোট টুকরা করে সবজি খাওয়ানো যেতে পারে। পাশাপাশি সূর্যমুখী বীজ এবং কালো তেল খাওয়ানো যেতে পারে। পাথর বালি কবুতরের হজমে সহযোগিতা করে। পাথর বালির সাথে ঝিনুকচূর্ণ, চারকোল, লবন এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থ মিশাতে হবে।
- কবুতরের বয়স ৫ থেকে ৬ মাস হলে এটি প্রজননের উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে তাকে পুরুষ বা স্ত্রী কবুতরের সাথে মেশার সুযোগ করে দিতে হবে যাতে তারা জোড়া বাঁধতে পারে এবং উর্বর ডিম উৎপাদন করতে পারে। কবুতর সাধারণত কাপ আকৃতির বাসা পছন্দ করে।
- খাঁচা পদ্ধতিতে কবুতর পালনে প্রতিদিন মূল-মুত্রের ট্রে পরিষ্কার করে খামারের ভেতরের পরিবেশ স্বাস্থ্যসম্মত রাখতে হবে। কোনো কবুতর অসুস্থ হলে দ্রুত আলাদা করে ফেলতে হবে। অসুস্থ বা মৃত কবুতর অভিজ্ঞ ভেটেরিনারীয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করিয়ে কারণ জেনে অন্যান্য জীবিত কবুতরের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।
- খামারে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবেলা করতে হবে।
- কঠোর হস্তে জীব নিরাপত্তা মেনে ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ছাত্রাক, পোটোজোয়া, পরজীবি, পোকামাকড়, বন্যপ্রাণি এবং বন্যপাখি ইত্যাদি খামারে পালিত কবুতরের বাসস্থানে প্রবেশ বা বেঁচে থাকা এবং সংক্রমন করা অথবা কবুতরকে আক্রমন করা থেকে বিরত রাখতে হবে।

কবুতরের রোগ-ব্যাধি

কবুতরের রোগ বালাই সাধারণ অন্যান্য পোল্ট্রির তুলনায় কম। সুষ্ঠু রোগ-প্রতিরোধের ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটলে নানা ধরণের রোগ দেখা দেয়। আমাদের দেশে কবুতরের যেসব রোগ দেখা যায় তা হলো: কবুতরের রাণীতে পক্স, নিউমোনিয়া, মাইকোপাজমোসিস, এসপারজিলোসিস, ঠান্ডা লাগা, ডাইরিয়া, ক্যামাইডিয়া/ ছিটাকোসিস, অরনিথোসিস, ক্যাংকার/ ক্রুপ ক্যাংকার/ট্রাইকোমোনিয়াসিস, রোপ, টিবি, ম্যালেরিয়া, সালমোনেলা/ প্যারাটাইফয়েড, কলেরা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পিজিয়ন হারপেস ভাইরাস ইত্যাদি। এছাড়াও কবুতরের মারাত্মক অন্তঃপরজীবি Round Worm, Hairworm, Tapeworm Ges Lung Wrom বহিঃপরজীবি উকুন, এয়ার সাক মাইট্স, স্কেলি লেগ মাইট ইত্যাদি। এছাড়াও ভিটামিন ও মিনারেল এর অভাবজনিত রোগ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কবুতরের মৃত্যুর হার প্রায় ১৫-২০%। কিছু কিছু খামারে কবুতরের মৃত্যুর হার ৮০% এর উর্ধ্বে হয়ে থাকে যদি কোন টিকা বা প্রতিরোধের ব্যবস্থা না নেওয়া থাকে। কবুতরের মৃত্যুর হার শীতকালে বেশী দেখা যায়।

কবুতরের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

বাণিজ্যিক কবুতরের খামারের যেসব রোগ দেখা যায় তার মধ্যে উলেখযোগ্য হল-রাণীক্ষেত, কবুতরের পক্স, সালমোনেলা, করাইজা ও পরজীবিজনিত রোগ। খামারী সাধারণ রানীক্ষেত ও পক্স হলে এন্টিবায়োটিক হিসেবে অক্সিট্রেটাসাইক্লিন ঔষধ ব্যবহার করেন। করাইজা হলে ডক্সিক্যাপ ঐষধ ব্যবহার করেন। উকুন, মাইটিস্ ও অন্ড়ঃপরজীবি যেমন- অংপধৎরফরধ (Round worm), capollaria, crop worm, hair worm, syngamus trachea (gape worm) প্রতিরোধে Vermic ইনজেকশন দিয়ে প্রোডাক্টস তৈরি করে থাকে এবং দেশের আনাচে কানাচে বড় বড় ঔষধের দোকান গড়ে উঠেছে। কবুতর খামারীরা তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও ভ্যাকসিন নিকটস্থ ভেটেনারী ফার্মেসী থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

টিকা প্রদান

বাণিজ্যিক কবুতরের খামারীগণ রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রণের জন্য রুটিন অনুসারে ঔষধ পত্র ব্যবহার করে থাকেন। বাণিজ্যিক পোল্ট্রি খামারের ন্যায় কবুতরের খামারে নিয়মিত ঔষধ ব্যবহার করা হয় তবে খামারের উৎপাদন বৃদ্ধি হয় এবং মারাত্মক রোগ বালাই এর ঝুঁকি অনেক কম হয়। নিম্নে বাণিজ্যিক কবুতরের খামারের রোগ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মডেল দেখানো হলো।

মডেল-০১ : বাণিজ্যিক কবুতরের খামারে রোগ-প্রতিরোধের জন্য ঔষধের ব্যবহার প্রণালী।

ঔষধের নাম	রোগের নাম	প্রয়োগ পদ্ধতি এবং কতদিন পর পর ব্যবহার
নবিলিস এনডিক্লোন ৩০ (Nobiles ND Clone 30)	কবুতরের রাণীক্ষেত রোগ	এন.ডি লাইভ ভ্যাকসিন ডাইলুয়েন্টে গুলিয়ে ১ ফোটা করে চোখে বা নাকে দিতে হবে প্রতি ৪৫ দিন পর পর।
ইমোপেস্ট (Emopest)	কবুতরের রাণীক্ষেত রোগ	কিল্ড ভ্যাকসিন চামড়ার নীচে এবং / অথবা মাংসপেশীর মধ্যে প্রতি কবুতরকে ০.৩ মিলি করে প্রতি ৪ মাস পর পর।
পিজিয়ন পক্স (Pigeon Pox)	কবুতরের পক্স	১ মাস বয়স হলে প্রতিটি কবুতরের ডানার নীচে সুচ ফুটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে বছরে ১ বার।
এভিনেক্স/এভিপারভেট/পাইপারভেট /পোলনেক্স	কৃমিনাশক	১ গ্রাম ৬-১০টি কবুতরকে সকালে পানি বা খাদ্যের সংগে প্রতি ৩ মাস পর পর খাওয়াতে হবে।
ভিটামিন বি-১+বি-২+বি-৬	ভিটামিনের ঘাটতি জনিত	১গ্রাম ১লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে মাসে ৫দিন।
ভিটা-এডিই/এসিভিট এডিই/ রেনাসল	ভিটামিন এডিই অভাবজনিত কারণে	যে কোন এডিই ভিটামিন ১মিলি ২ লিটার পানিতে মিশিয়ে মাসে ২ বার রাতের বেলায় দিতে হবে।
সানক্যালভেট-ডি/ ক্যালটেট-ডি	ক্যালসিয়ামের অভাব	১মিলি/২ লিটার পানিতে খাওয়াতে হবে মাসে ২-৩দিন।
এরোসল (এসিআই)	উকুন ও মশা দমন	প্রতিদিন ১বার এরোসল স্প্রে করতে হবে।
স্যালাইন	ডিহাইড্রেশন	তাপমাত্রা বা ধকল হলে ১গ্রাম ২লিটার পানিতে মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।

গরু ও ছাগল/ভেড়া পালন

গরু ও ছাগল/ভেড়ার বাসস্থান ব্যবস্থাপনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের দেশে গরু ও ছাগল/ভেড়া পালনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফলন না পাওয়ার যে কয়টি কারণ আছে তার মধ্যে অনুন্নত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। সঠিক বাসস্থান ব্যবস্থাপনার অভাবে উৎপাদন অনেক কমে যাচ্ছে এবং কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে দিনে দিনে গরু-ছাগল/ভেড়া পালনে কৃষকদের অনীহা তৈরি হচ্ছে। এই জন্য গরু ও ছাগল/ভেড়া বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

- গরু ও ছাগল/ভেড়া বাসস্থান ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
- গরু ও ছাগল/ভেড়া সঠিক বাসস্থান তৈরির বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা।
- বাসস্থান তৈরির বিষয়ে কোন কোন বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ তা জানা।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট
উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, একটি আদর্শ গরু ও ছাগলের ঘর।
পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরনের ব্যবহার

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গরু ও ছাগল/ভেড়া বাসস্থান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- ঘর কেন প্রয়োজন?
- আপনারা গরু ও ছাগল/ভেড়া কেমন ঘরে রাখেন?
- প্রাপ্তবয়স্ক একটি গরু রাখার জন্য কতটুকু জায়গা দিতে হবে?
- একটি ছাগলের জন্য কতটুকু জায়গা দরকার?
- একটি আদর্শ গোয়াল ঘর কেমন হওয়া উচিৎ?
- একটি আদর্শ ছাগল/ভেড়ার ঘর কেমন হওয়া উচিত?
- কিভাবে আমরা বর্তমান ঘরকে আদর্শ ঘরে রূপান্তরিত করতে পারি?
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন।
- ম্যানিলা পেপারে একটি আদর্শ গরু ও ছাগল/ভেড়া ঘরের নকশা উপস্থাপন করে গরু ও ছাগল/ভেড়া ঘরের আকার, আলো বাতাস চলাচলের বিষয়সমূহ এবং ঘরের মাপ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিন।

- কিভাবে কৃষকদের বর্তমানের গরু ও ছাগল/ভেড়া ঘরে আলো বাতাস চলাচল এবং প্রয়োজনীয় আয়তন ঠিক রাখা যায় তা বুঝিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে বাস্তবে একটি ঘর পরিদর্শন করুন। ঘরটিতে কি কি সুবিধা ও কি কি অসুবিধা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন এবং সে আলোকে একটি আদর্শ গরু ও ছাগল/ভেড়া ঘর তৈরির সহজ কৌশল বুঝিয়ে দিন।
- আপনারা গরু ও ছাগল/ভেড়ার ঘরের ব্যবস্থাপনা কিভাবে করেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন এবং ঘর তৈরীতে এবং ঘর ব্যবস্থপনা করতে উদ্ভোদ্ধকরুন ।

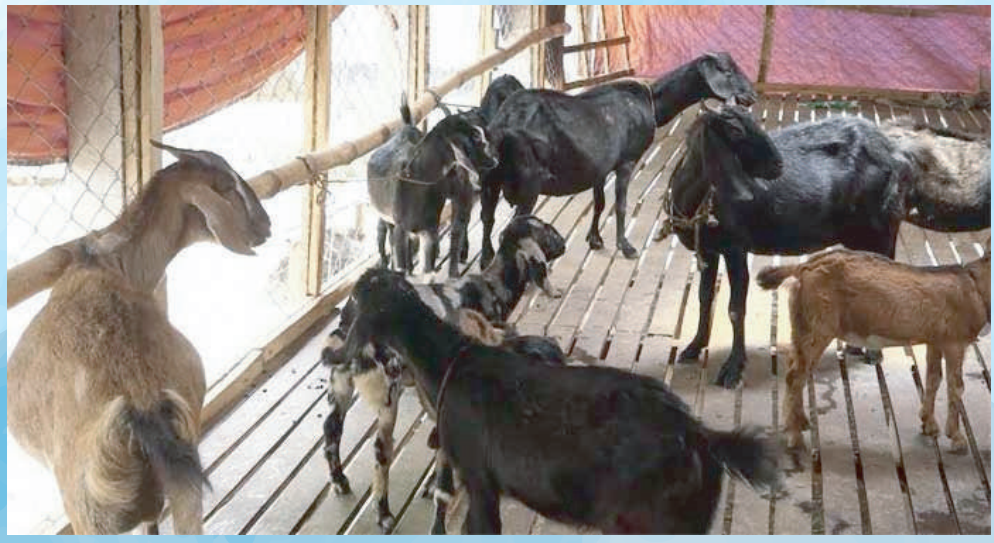

কারিগরি নোট

বাসস্থান : যেখানে প্রাণিকে নিরাপদে ও আরামে থাকতে দেয়া হয় তাই বাসস্থান।

বাসস্থান কেন দরকার

- বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে রক্ষা করার জন্য
- রাত্রি যাপন করার জন্য
- বিভিন্ন বন্য প্রাণি এবং চোর ও দুষ্কৃতকারীদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করার জন্য
- আরামদায়ক পরিবেশ প্রদান করার জন্য
- ঝড়, বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য
- স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য
- সহজে পরিচর্যা করার সুবিধার জন্য
- সহজে খাদ্য প্রদানের সুবিধার জন্য
- বিশ্রামের জন্য
- রোগ প্রতিরোধের জন্য।

আদর্শ ঘরের বৈশিষ্ট্য

- ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করবে।
- দক্ষিণমূখী ঘরে আলো বাতাস বেশি প্রবেশ করে।
- ঘরটি ভিটি উঁচু হবে। পয়:নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকবে।
- ঘরটি শুকনা হবে।
- স্যাঁতসেঁতে কোন ভাব থাকবেনা।
- পরিমাণ মত জায়গা থাকবে।
- দুর্গন্ধ মুক্ত হবে।
- ঘরে বৃষ্টির পানির ছাট ঢুকবেনা।

আদর্শ গরুর বাসস্থানের বৈশিষ্ট্য

- গরুর জন্য উঁচু এবং পয়:নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে এবং ছায়াযুক্ত স্থান যেখানে আলো বাতাস চলাচল করে
- এমন জায়গায় ঘরটি তৈরি হলে খুব ভালো হয়।
- ঘরটি পূর্বে ও পশ্চিমে লম্বা হলে ভালো হবে
- একটি প্রাপ্ত বয়স্ক গরুর জন্য ৩০-৩৫ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন হয়।
- গাভি দাঁড়ানোর জন্য ৫.৫ ফুট থেকে ৬.৫ ফুট জায়গার প্রয়োজন।
- আর্দ্রতায় নষ্ট হয় না এমন জায়গা হতে হবে।
- মেঝে থেকে ছাদ ৮-১০ ফুট উঁচু হতে হবে।
- টিনের ছাউনি দিলে নিচে চাটাই দিতে হবে।
- ঘরের ভিটির মাঝখান উঁচু হবে এবং এক পাশ ঢালু হবে।
- গরুর জন্য মসারির ব্যবস্থা করতে হবে।

গরু ও ছাগল/ভেড়া পালনে প্রয়োজনীয় ঘরসমূহ

- গোয়াল ঘর/গরুর ঘর
- রোগাক্রান্ত প্রাণি রাখার ঘর
- খাদ্য মজুদ ঘর

ছোট খামারের জন্য সস্তায় ঘর প্রস্তুত : ৫-১০ টি গরু রাখার ঘর

ঘরের খুঁটি

- ভাল পাকা বাঁশের গোড়ায় আলকাতরা ও পলিথিন দ্বারা মুড়ে খুঁটি ব্যবহার করা যায়।
- ভাল শক্ত কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা যায়।

ঘরের চাল

- দুই পর্দা বাঁশের চাটাই/খলপা/দাড়ি এর মধ্যে পলিথিন ব্যবহার করে চালা তৈরি করা যায়।
- এই চালা একচালা/দোচালা যুক্ত হতে পারে।

ঘরের মেঝে

- ঘরের মেঝেতে এক/দুই স্তর ইট বিছিয়ে সোলিং করা যায়।
- ইটের ফাঁকে সিমেন্ট ও বালু দিতে হবে।
- এইভাবে সেমি পাকা মেঝেতে অল্প খরচে গরু পালন করা যায়।

পিপা/চাড়ি

- সম্ভব হলে ইট সিমেন্ট দ্বারা চাড়ি (পিপা) তৈরি করা যায়।
- বাজারে মাটির তৈরি খাবার পাত্র হিসাবে চাড়ি কিনতে পাওয়া যায়।
- বালতি/স্বতন্ত্র চাড়িতে পানি দেয়া যায়।

গরুর সারি

- ছোট ঘরে সাধারণত ১ সারিতে গরু পালন করতে সুবিধা হয়।

ঘরের আকার

- প্রতিটি গরু দাঁড়ানোর জন্য ৫ ফুট এবং শোবার জন্য ৩.৫ ফুট জায়গা লাগে
- ১টি গরুর জন্য গরুর ঘরের মেঝের পরিমাণ হবে (৫X ৩.৫) বর্গফুট=১৭.৫ বর্গফুট

প্রধানত বাঁধা গোশালা দু ধরনের হয় যথা- (ক) এক সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা।

(ক) এক সারি বিশিষ্ট গোশালা

সাধারণত অল্পসংখ্যক গবাদি প্রাণির জন্য গ্রাম অঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িতে একটি লম্বা সারিতে গরু বেঁধে পালনের জন্য এ ধরনের গোশালা তৈরি করা হয়। এ ধরনের গোশালার পালনের জন্য গরুর প্রয়োজনীয় জায়াগার পরিমান টেবিরে দেয়া হলো। প্রাণির সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জায়গা নির্ধারণ করে গোশালা তৈরি করতে হয়। প্রতিটি প্রাণিকে পৃথক রাখার জন্য লোহার তৈরি জি আই পাইপ দিয়ে পার্টিশন দেয়া ভাল। সাধারণত পার্টিশনেরপাইপ লম্বায় ৯০ সেঃ মিঃ (৩ ফুট) ও উচ্চতায় ৪৫ সেঃ হওয়া প্রয়োজন। গোশালা হবে এক চালা বিশিষ্ট ঘর । এক চালা ঘরের ছাদ প্রায় ৩০০ সেঃ মিঃ। (১০ ফুট) উঁচু করতে হয়।

(খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা

অধিক সংখ্যক প্রাণি পালনের জন্য দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালা প্রয়োজন হয়। এই ধরনের গোশালায় প্রাণি কে দু'ভাবে দু'সারিতে রাখা হয় যথা- (অ) মুখোমুখি পদ্ধতি এবং (আ) লেজের দিকে সোজা বা পিছো পিছি পদ্ধতি।

টেবিল : এক সারি বিশিষ্ট গোশালায় প্রতিটি গবাদিপ্রাণির জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ

গবাদিপ্রাণি	দাঁড়াবার স্থান (সেঃ মিঃ)	পাশের জায়গা (সেঃ মিঃ)	খাবার পাত্র(সেঃ মিঃ)	নালা (সেঃ মিঃ)
	১৬৫	১০৫	৭৫	৩০

মুখোমুখি পদ্ধতি (Face in or Face to face system)

এ পদ্ধতিতে গোশালায় দুই সারি প্রাণি সামনা সামনি থকে। আর দু'সারি খাবারের চাড়ি বা খাবার পাত্রের মাঝখানে ৪ ফুট বা ১২০ সেঃ মিঃ চওড়া রাস্তা থাকে যা খাবারের পাত্রে খাবার দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। দাঁড়াবার স্থান গরুর জন্য ৫.৫ ফুট । পাশের জায়গা গরুর জন্য ৩.৫ ফুট প্রয়োজন হয়।

মুখোমুখি পদ্ধতির সুবিধা সমূহ

(ক) দেখতে ভাল লাগে। (খ) প্রাণি নিজ জায়গায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। (গ) সূর্যালোক নালায় পড়ায় রোগ জীবানু ধ্বংস হয়। (ঘ) একসাথে দুই সারি প্রাণি কে খাবার সরবরাহ সুবিধাজনক । (ঙ) দুধ দোহনের সময় অধিকতর আলো পাওয়া যায়। (চ) অপ্রশস্থ জায়াগায় এ ধরনের গোশালা সুবিধাজনক।

(আ) লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি পদ্ধতি (Face out or Tail to tail system) এই পদ্ধতিতে উভয় সারির মাথা বর্হিমূখী থাকে। এ ধরনের গোশালায় দু'সারি গরু দাঁড়াবার জায়গার জন্য ৬.০ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

পিছোপিছি পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- গোশালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময় কম লাগে।
- গোবর ও আবর্জনা পরিস্কার, প্রাণির শরীর পরিস্কার ও দুধ দোহনের জন্য মাঝখানের সাধারণ পথটি বেশ উপযোগী।
- এক গরুর শ্বাস প্রশ্বাস অন্য গুরুর দেহে লাগানো ও গরু বাহিরের দিকে থেকে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহন করতে পারে যা স্বাস্থ্য সম্মত।
- এই পদ্ধতিতে প্রাণির পশ্চাদভাগ সহজে দৃষ্টি গোচর হয়।
- ঘরের দেয়াল পরিস্কার থাকে এবং এক প্রাণিকে থেকে অন্য প্রাণিতে রোগ জীবানু ছাড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

আদর্শ ছাগলের বাসস্থানের জন্য বিবেচ্য বিষয়

- পর্যাপ্ত আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- পূর্ণ বয়স্ক ছাগলের জন্য ১০-১২ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।
- বাচ্চা ছাগলের জন্য ৪-৬ বর্গফুট জায়গার প্রয়োজন।
- ছাগলের বাসস্থান উঁচুজায়গায় হতে হবে। ছাগলের ঘরের মধ্যে মাচা করে দিতে হবে। শীতকালে মাচার উপর ৪-৫ ইঞ্চি পুরু করে খড় বিছিয়ে দিতে হবে এবং মাচার উপরের খোলা অংশ চট দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- প্রতিটি ছাগলের জন্য ঘর ২ হাত দৈর্ঘ্য, ২ হাত প্রস্থ এবং ৩-৫ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট হতে হবে এবং ১০টি ছাগলের জন্য ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও ৪ হাত প্রস্থ মাপের ঘর প্রয়োজন।
- ছাগল পালন করার জন্য লম্বা করে দক্ষিণ-মুখী ঘর করতে হবে।
- ঘরের চারপাশে আলো-বাতাস প্রবেশ করার মত ব্যবস্থা রেখে বেড়া দিতে হবে।
- ঘরের মধ্যে ২ ফুট উঁচু করে মাচা করে দিতে হবে। মাচার কাঠ বা বাঁশের মধ্যে আধা ইঞ্চি করে ফাঁক রাখতে হবে যেন ময়লা নিচে পড়ে যায়। উঁচু মাচায় উঠতে সিঁড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।
- গর্ভবতী ছাগীর জন্য খড়কুটা দিয়ে নরম বিছানা যুক্ত করলে ভাল হয় এবং পৃথক থাকার ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- সপ্তাহে একবার জীবাণু নাশক দিয়ে ঘর জীবাণু মুক্ত করতে হবে।
- ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে।

ছাগলের ঘরে মাচা তৈরি করার সুবিধা

- ছাগল ঠান্ডা-প্রবণ প্রাণি। অল্পতে ছাগলের ঠান্ডা লেগে নিউমোনিয়া হয়ে ছাগল মারা যেতে পারে। তাই ছাগলকে ঠান্ডা হতে বাচানোর জন্য মাচা তৈরি করতে হয়।
- মাচা ফাঁকা ফাঁকা হওয়ার কারণে পায়খানা এবং প্রস্রাব খুব সহজেই গড়িয়ে পড়ে যায়। এতে ঘর ভেজা
- থাকেনা এবং নোংরাও হয়না।
- ঘর পরিস্কার করা খুব সহজ হয়।
- ঘরে বাতাস ঢোকার পর্যাপ্ত জায়গা থাকায় ঘরটি শুকনা থাকে এবং কখনো অক্সিজেনের ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কিভাবে সহজেই আমরা ছাগলের বর্তমান ঘরটিকে উন্নত করতে পারি

খুব সহজেই আমরা ছাগলের বর্তমান ঘরটিকে উন্নত করতে পারি। এজন্য আমাদের প্রথমেই ঘরের ভিতর ১.৫-২ ফুট উঁচু করে আধা ইঞ্চি/ এক আঙ্গুল ফাঁকা ফাঁকা করে একটি মাচা তৈরি করে ফেলতে হবে। ঘরে আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা না থাকলে জানালা কেটে আলোবাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। এতে আমাদের বর্তমান ছাগলের ঘরটি কিছুটা উন্নত ও আধুনিক হবে।

ছাগলের ঘরের ব্যবস্থাপনা

অপরিস্কার বাসস্থান ছাগলের রোগের কারণ হতে পারে। ছাগলের ঘর নিয়মিত পরিস্কার রাখতে হবে। বৃষ্টির পানির ছাট থেকে ঘরকে রক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। শীতের সময় ঘরে বাতাস ঢোকার জায়গাগুলোতে চটের বস্তা/চট ঝুলিয়ে দিলে ঘরে ঠান্ডা বাতাস ঢুকবেনা আবার অক্সিজেনের ঘাটতিও হবেনা। ঘরের চারদিকে পলিথিন জাতীয় কিছু না ঝুলানোই ভালো কারণ এগুলো অক্সিজেনের ঘাটতি ঘটাতে পারে। শীতে পুরু করে খড় দিয়ে ছাগল রাখলে ঠান্ডা লাগবেনা। ঘরে ছাগল আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার ও পানির পাত্র দিতে হবে যেন সকল ছাগল ভালোভাবে খেতে পারে। খাবার ও পানির পাত্র নিয়মিত পরিস্কার করতে হবে।

গবাদিপ্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনা
পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের দেশের কৃষকরা গবাদিপ্রাণির খাদ্যের বিষয়ে তেমন সচেতন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, গবাদি প্রাণির খাবারের বিষয়ে তেমন কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করেন না। এতে করে গবাদিপ্রাণির বাড়বাড়তি এবং দুধ উৎপান কম হয়। অনেকেই গবাদিপ্রাণি ওজন অনুসারে কি কি খাবার কি পরিমাণ লাগবে সে বিষয়ে কোন ধারনা নাই। এই সেশনে গবাদিপ্রাণির খাবার বিষয়ে কৃষকদেরকে ধারনা দেয়া হবে।

উদ্দেশ্য

- গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন খাবার সম্মন্ধে ধারনা পাবে।
- গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন প্রকার খাদ্য চিনতে পারবে।
- গবাদিপ্রাণির দানাদার খাবার তৈরি শিখবে।

সময় : ১.৩০ মিনিট

উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন প্রকার খাবারের নমুনা।

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গবাদিপ্রাণির খাদ্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের প্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- গরু, ছাগল/ভেড়ার সাধারণত কি কি ধরণের খাবার খায়?
- প্রতিদিন কতটুকু ঘাস ও খড় দিতে হয়?
- গরু, ছাগল/ভেড়ার দানাদার খাদ্য কতটুকু দিতে হয়?
- দানাদার খাবার তৈরীতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করেন?
- দৈনিক কি পরিমাণ খাবার দুধের গাভীর জন্য খাওয়ানো হয়?
- দৈনিক কি পরিমাণ খাবার ছাগল/ভেড়ার জন্য খাওয়ানো হয়?
- আমাদের মধ্যে সবাই কি গরু মোটাতাজাকরণ করি?
- গরুকে কি কোন দানাদার খাবার দেই?
- ইউ.এম এস কি?
- দানাদার খাবার এ লাভ কি? এ খাবার আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি কি?
- আপনি আপনার গরুকে কি কি খাদ্য দেন ?
- ইউ.এম এস কি? এর উপাদান গুলো কি কি? ১ কেজি ইউ.এম এস তৈরির উপাদান গুলোর অনুপাত কি হবে?
- ইউ.এম.এস খাওয়ানোর উপকারিতা কি কি?

- ইউ.এম.এস এর উপকরণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায়?
- ইউ.এম.এস খাওয়ানোর সতর্কতা কি হবে?
- খাদ্যকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?
- রেশন কি? গরু মোটাতাজাকরণ রেশন এত গুরুত্ব পূর্ণ কেন।
- ১ কেজি দানাদার খাদ্য তৈরির জন্য কি কি উপাদান কি হারে প্রয়োজন।
- গরুকে দৈনিক কতটুকু করে দানাদার খাদ্য দিতে দিতে হবে।

অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর বাহির করুন, উত্তরের জন্য সময় দিন, প্রয়োজনে সহায়তা করন। গবাদিপ্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নমুনা প্রদর্শন করুন এবং উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নিন, ধারনাগুলো পরিস্কার করুন এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।

- বিভিন্ন ধরনের আঁশ জাতীয়/দানাদার/খড় ইত্যাদির নমুনা সংগ্রহ করুন
- বিভিন্ন খাদ্য উপকরণ দিয়ে গরুর এবং ছাগলের এক কেজি দানাদার খাদ্য প্রশিক্ষণার্থীদেরকে দ্বারা তৈরী করুন। অথবা তৈরি করতে সহায়তা করুন।

কারিগরি নোট

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

গরুর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

একটি পুর্ণবয়স্ক গরুর জন্য দৈনিক কাঁচা ঘাস ৮-১০ কেজি এবং প্রয়োজন মত শুকনা খড়কুটা দিতে হয়। খড়কুটা গরুর খাবারের মধ্যে মানের দিক থেকে নিম্ন মানের একটি খাবার। সাধারণত আমাদের গ্রামগুলোতে গরু খড়ের পালা হতে টেনে টেনে খড় বের করে খায় এতে একদিক দিয়ে যেমন গরুর শক্তি নষ্ট হয় অন্যদিকে খড়ের অপচয় ঘটে এবং শুকনা খড়ের হজমও কম হয়। আমরা যদি খড়কে ৪-৬ ইঞ্চি করে কেটে দেই এবং দেওয়ার সময় ভিজিয়ে/ধুয়ে দেই তাহলে খড়ের অপচয় কম হবে, খড় নরম হওয়ায় ভালোভাবে হজম হবে এবং খাওয়ার জন্য শক্তিও কম ব্যয় হবে। কাঁচা ঘাস দেওয়ার সময়ও কেটে ছোট ছোট করে দিলে খাওয়ার সময় তেমন একটা অপচয় হয়না।

দানাদার খাদ্য

গরুর দানাদার খাদ্য তৈরির তালিকা

খাদ্য উপাদান	খাদ্যের কাজ	শতকরা পরিমাণ (%)	বাটি হিসাবে
গম ভাঙ্গা চাল ভাঙ্গা ভুট্টা ভাঙ্গা গমের ভুষি চালের কুঁড়া/রাইস পলিশ	শক্তিদায়ক খাদ্য	৬৫-৭৫%	৬.৫-৭.৫ বাটি
সরিষার খৈল তিলের খৈল ডাল ভাঙ্গা ডালের ভুষি	ক্ষয়পুরণ ও বৃদ্ধিদায়ক খাদ্য	২০-৩০%	২.০-৩.০ বাটি
ডিসিপি লবণ ভিটামিন	রোগ প্রতিরোধক খাদ্য	২-৫ %	১/৪ বাটি

উদাহরণস্বরূপ নিম্নের ছক অনুযায়ী ১ কেজি খাবার তৈরি করে দেখান

ক্র.নং	খাদ্য উপাদান	পরিমাণ (গ্রাম)		শতকরা
১	ভূট্টা ভাঙ্গা/ চাল ভাঙ্গা/গম ভাঙ্গা	৩০০	৭০০ গ্রাম	৭০ %
২	গমের ভুষি	২০০		
৩	চালের কুঁড়া	২০০		
৪	সরিষার খৈল	১০০	২৭৫গ্রাম	২৭.৫%
৫	ডালের ভুষি	১০০		
৬	তিলের খৈল	৭৫		
৭	ডিসিপি	১৫	২৫ গ্রাম	২.৫%
৮	লবণ	৭		
৯	ভিটামিন	৩		
	মোট	১০০০ গ্রাম = ১ কেজি	১০০০ গ্রাম = ১ কেজি	১০০ %

ব্যবহারিক : সহায়তাকারী হাতেকলমে ১ কেজি পরিমাণ দানাদার খাদ্য তৈরি করে দেখাবেন/ সদস্যদের দিয়ে তৈরি করাবেন।

নিচের তালিকা অনুযায়ী গরুর ওজনের উপর নির্ভর করে গরুকে দানাদার খাবার দিতে হবে:

রসদ বা রেশন :

গবাদি প্রাণিকে দৈনিক অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্য সমষ্টি খেতে দেয়া হয় তাকে রসদ বা রেশন বলে। দৈনিক চাহিদা ও উপৎপাদনের উপর ভিত্তি করে প্রাণি খাদ্যকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ।

(১) সুষম খাদ্য : যেসব খাদ্য প্রাণি দেহের দৈনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ও অনুপাতের সব রকম পুষ্টিকর উপাদান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি প্রাণির জন্য সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। কারণ সুষম খাদ্যের অভাব হলে প্রাণি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর উপাদান পায়না ফলে তার দহ গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

(২) স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য : প্রাণির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরবৃত্ত বিষয়ক কার্যাবলী যথা শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তি যোগান দেয় যে খাদ্য তাকে স্বাস্থ্য রক্ষণ খাদ্য বলে।

খড়ের প্রক্রিয়াজাতকরণ / ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় ঃ

ইউএমএস ঃ ইউএমএস হল এক ধরনের ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড়ের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য যা গরুকে হৃষ্টপুষ্ট করে।

১ কেজি ইউএমএস তৈরি

- ১ কেজি খড়
- ৫০০ মিলি পানি
- ২৫০ গ্রাম চিটাগুড়
- ৩০ গ্রাম ইউরিয়া

তৈরির নিয়ম

প্রথমে একটি পাত্রে ইরিয়া সার গুলে নিতে হবে। অতঃপর ইউরিয়া মেশানো পানিতে চিটাগুড় মিশাতে হবে । মেঝেতে একটি পলিথিন বিছিয়ে খড় ছোট ছোট টুকরা (৪-৬ ইঞ্চি) করে কেটে ছড়িয়ে বিছাতে হবে ইউরিয়া এবং চিটাগুড় মিশ্রিত দ্রবণ খড়ের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে যেন খড়ের সাথে লেগে যায় এরপর বিছানো খড় উল্টে দিয়ে নিচের শুকনা অংশ উপরে এনে ইউরিয়া ও চিটাগুড় দ্রবণ আবার ছিটাতে হবে দ্রবণ মিশানো শেষ হলে খড়গুলোকে পলিথিন পেছিয়ে তুলে রাখতে হবে যাতে এত কোন বাতাস ঢুকতে না পারে। মিশ্রত খড় আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর শুরু করা যেতে পারে।

প্রতি ১০০ কেজি ওজনের গরুকে ২ কেজি ইউএমএস , ১০০-১৫০ কেজি ওজনের গরুকে ৩ কেজি ইউএমএস এবং ১৫০-২০০ কেজি ওজনের গরুকে ৪ কেজি পর্যন্ত ইউএমএস খাওয়ানো যায়।

শুরর দিকে ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড়ের অল্প পরিমাণে স্বাভাবিক খড়/ ঘাস/ কুঁড়া মিশিয়ে অভ্যস্থ করাতে হবে।

ইউরিয়া মোলাসেস মিশ্রিত খড় খাওয়ানোর সতর্কতা

- এই খাদ্য প্রস্তুত করার ৩০ মিনিট পরই খাওয়ানো যায়।
- ৩ দিনের বেশি রাখা যাবে না।
- ইউরিয়ার পরিমাণ কম বা বেশি করা যাবে না।
- পানির পরিমাণ বেশি দেয়া যাবে না।
- খাওয়ানোর সাথে সাথে পানি দেয়া যাবে না।
- ১ বছরের কম বয়সের বাছুরকে দেয়া যাবেনা।

গরুর খাদ্য তালিকা

গরুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, দৈহিক বৃদ্ধি এবং প্রাতহিক কর্মক্ষমতার জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যেমন পানি, শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন । বিভিন্ন ধরনের গরু খাদ্য তালিকা টেবিলে ।

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ
১	গমের ভুষি	৪০০ গ্রাম
২	চালের কুড়া	২২০ গ্রাম
৩	ডালের ভূষি	১৫০ গ্রাম
৪	খৈল	২০০ গ্রাম
৫	লবন	১০ গ্রাম
৬	ডিসিপি	১০ গ্রাম
	ডিবি পাউডার	১০ গ্রাম
মোট		১০০০ গ্রাম

প্রতি ১০০ কেজি ওজনের গরুকে ৪-৫ কেজি সবুজ ঘাস খাওয়াতে হবে এবং মোট শরীর ওজনের ১-২% দানাদার খাদ্য দিতে হবে।

ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ছাগলের দানাদার খাদ্য তৈরি : ১ কেজি দানাদার খাবার তৈরির উপাদান

১) চালের কুঁড়া---- ৫০%	৫০০ গ্রাম
২) চাল ভাঙ্গা ------ ৪২%	৪২০ গ্রাম
৩) ডালের ভুসি ---- ৫%	৫০ গ্রাম
৪) লবণ ---------- ১%	১০ গ্রাম
৫) ঝিনুক ভাঙ্গা (DCP) ২%	২০ গ্রাম
মোট	১০০০ গ্রাম/ ১ কেজি

ব্যবহারিক : সহায়তাকারী কৃষক-কৃষাণিদের দিয়ে ১ কেজি দানাদার খাবার তৈরি করে দেখাবেন

বাচ্চার খাদ্য

ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল সাধারণত একাধিক বাচ্চা প্রসব করে থাকে। তাই সবগুলো বাচ্চা যেন সমানভাবে প্রয়োজনমত দুধ পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ঠিকমত না খেয়াল করলে সবল বাচ্চাগুলো ইচ্ছামত দুধ খেয়ে ফেলে। এজন্য দেখা যায় দুর্বল বাচ্চাগুলো দুধ খেতে না পেয়ে অপুষ্টিতে ভুগে অকালে মারা যায়। এজন্য বাচ্চাদেরকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর ব্যাপারে খুব সজাগ থাকতে হবে।

বয়স অনুযায়ী ছাগলের বাচ্চার খাদ্য

বয়স (দিন)	প্রতি কেজি ওজনের জন্য দুধ (গ্রাম)	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	কচি ঘাস
০-১৪ দিন	১৫০ গ্রাম		
১৫-৩০ দিন	১৭৫ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ	সামান্য পরিমাণ
৩১-৪৫ দিন	২০০ গ্রাম	২০ গ্রাম	সামান্য পরিমাণ
৪৬-৬০ দিন	১৭৫ গ্রাম	৪০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী
৬০-৭৫ দিন	১৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	চাহিদা অনুযায়ী

বাড়ন্ত ছাগলের খাদ্য ব্যবস্থাপনা

মায়ের দুধ ছাড়ার পর বাচ্চার খাদ্যের অবস্থা খুব জটিল পর্যায়ে থাকে। যেহেতু এসময় মাযের দুধ পায়না আবার সময়টিও বাড়ন্ত তাই খাদ্যের অন্যান্য ব্যবস্থাপনার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়। ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের বেলায় ৪-১৪ মাস বয়সকে বাড়ন্ত সময় বলা হয়। যে সকল ছাগলকে মাংস বা বাচ্চা উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে তাদের পুষ্টি বা খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। জন্মের ২য় সপ্তাহ থেকে ছাগলকে ধীরে ধীরে অল্প অল্প করে দানাদার খাদ্যে অভ্যস্ত করতে হবে।

ছাগলের ওজন (কেজি)	দৈনিক দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	দৈনিক ঘাস সরবরাহ/ চরানো ঘাস (কেজি)
৪	১০০	০.৪
৬	১৫০	০.৬
৮	২০০	০.৮
১০	২৫০	১.০
১২	৩০০	১.০
১৪	৩৫০	১.৩
১৬	৩৫০	১.৫
১৮ কেজি	৩৫০	২.০

গর্ভবতী ছাগীর খাদ্য

গর্ভবতী ছাগীর পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে হয়। তা না দিলে বাচ্চা দুর্বল হয়। এমনকি বাচ্চা মৃত প্রসব করার আশংকা থাকে। ছাগলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, মায়ের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং পূনরায় গর্ভধারণ করতে দেরি হয়। তাই ছাগল গর্ভবতী অবস্থায় খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

খাসির খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগল পালনকারীদের কাছে খাসির গুরুত্ব অপরিসীম। খাসি প্রথম দিক থেকেই যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তবে বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয় অন্যদিকে তার চেহারাও আকর্ষণীয় হয় না। ফলে ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। দুধ ছাড়ানোর পর খাসি ছাগলকে পরিমাণমত খাদ্য খাওয়ালে গড়ে দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে এবং এক বছরের মধ্যে খাসি ১৮-২০ কেজি ওজনের হতে পারে।

নিম্নে খাসি ছাগলের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেয়া হল

বয়স (মাস)	কাঙ্খিত ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (মিলি)
৩	৬.০	০.৪০০	১০০	৪০০
৪	৭.৮	০.৪৫০	১০০	৪০০
৫	৯.৬	০.৫০০	২০০	৪০০
৬	১১.৫	০.৬০০	২৫০	৪০০
৭	১৩.২	০.৮০০	২৫০	৪০০
৮	১৫.০	১.০০০	৩০০	৪০০
৯	১৬.৮	১.০০০	৩০০	৪০০
১০	১৮.৬	১.২০০	৩০০	৪০০
১১	২০.৫	১.৩০০	৩০০	৪০০
১২	২২.২	১.৩০০	৩০০	৪০০

গর্ভবতী ছাগীর খাদ্য

গর্ভবতী ছাগীর পর্যাপ্ত খাদ্য দিতে হয়। তা না দিলে বাচ্চা দুর্বল হয়। এমনকি বাচ্চা মৃত প্রসব করার আশংকা থাকে। ছাগলের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়, মায়ের দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায় এবং পূনরায় গর্ভধারণ করতে দেরি হয়। তাই ছাগল গর্ভবতী অবস্থায় খাদ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হয়।

খাসির খাদ্য সরবরাহের তালিকা

ছাগল পালনকারীদের কাছে খাসির গুরুত্ব অপরিসীম। খাসি প্রথম দিক থেকেই যদি প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পায় তবে বৃদ্ধি যেমন ব্যাহত হয় অন্যদিকে তার চেহারাও আকর্ষণীয় হয় না। ফলে ক্রেতা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়। এজন্য ছাগল পালনের মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। দুধ ছাড়ানোর পর খাসি ছাগলকে পরিমাণমত খাদ্য খাওয়ালে গড়ে দৈনিক ৫০-৬০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে এবং এক বছরের মধ্যে খাসি ১৮-২০ কেজি ওজনের হতে পারে।

নিম্নে খাসি ছাগলের জন্য একটি খাদ্য তালিকা দেয়া হল

বয়স (মাস)	কাঙ্খিত ওজন (কেজি)	ঘাস/পাতা	দানাদার খাদ্য (গ্রাম)	ভাতের মাড় (মিলি)
৩	৬.০	০.৪০০	১০০	
৪	৭.৮	০.৪৫০	১০০	
৫	৯.৬	০.৫০০	২০০	
৬	১১.৫	০.৬০০	২৫০	
৭	১৩.২	০.৮০০	২৫০	
৮	১৫.০	১.০০০	৩০০	
৯	১৬.৮	১.০০০	৩০০	
১০	১৮.৬	১.২০০	৩০০	
১১	২০.৫	১.৩০০	৩০০	
১২	২২.২	১.৩০০	৩০০	

মোটাতাজাকরণের জন্য গরু নির্বাচন ও কৃমিমুক্তকরণ
পাঠপরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

- মোটাতাজাকরণের জন্য সঠিক গরু চিনতে সহায়তা হবে
- কৃমিমুক্তকরণ এর নিয়ম জানতে পারবে।

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট
উপকরণ : ফ্লিপ চার্ট , একটি ২ বছরের গরু
পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের গবাদিপ্রাণির বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- আপনারা মোটাতাজাকরণের জন্য কি ধরণের গরু বাছাই করবেন?
- গরুর বয়স কত হতে হবে?
- গরুর আকার আকৃতি কেমন হলে ভালো হয়?

সহায়তাকারী এখন গরু নির্বাচন প্রয়োজন এবং কীভাবে ক্রিমি মুক্তকরণ করা যায় তা আলোচনা করবেন । তথ্য প্রদান হবে অংশগ্রহণমূলক। এটি একক কোন বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে নয়। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আলোচনায় সংযুক্ত করতে হবে। গরুকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত পারে।

- কি কি বৈশিষ্ট্য গরু নির্বাচনের জন্য থাকা উচিত বলে আপনারা মনে করেন ?
- কেন জাত ও বয়স এত বেশি গুরুত্ব পূর্ণ ?
- কোন কোন জাত গরু মোটাতাজাকরণের জন্য উপযোগি বলে আপনাদের মনে হয় ?
- ক্রিমি আক্রান্ত হলে গরুর কি কী কী লক্ষণ দেখা যায়?
- সুস্থ এবং অসুস্থ বা গরর কিভাবে পার্থক্য করা যায়?
- গরু কৃমি আক্রান্ড় হলে আপনারা কি করেন?

- গরু কৃমি আক্রান্ত হলে বা কৃমি মুক্ত রাখার জন্য কি করা উচিত বলে মনে করেন?
- কৃমিমুক্ত করার পর গরুকে কোন কিছু দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?
- যৌথ কর্যক্রম কি?
- যৌথ কর্যক্রম কি ভাবে আপনাকে লাভবান করতে পারে ?
- গরুর দাঁত কয়টি থাকে?
- দুইটি দাঁত থাকলে বয়স কত হবে ?
- কেন দুইটি দাঁতের গরু মোটাতাজাকরণের জন্য গুরুত্ব পূর্ণ ?
- আমরা আমাদের এই অভিজ্ঞতা কিভাবে অন্য কৃষকদের মাঝে বিনিময় করতে পারি?

গরু হৃষ্টপুষ্ট করণ

কারিগরি নোট

মোটাতাজাকরণের জন্য প্রাণির বৈশিষ্ট্য

১. গবাদিপাণির বংশ পূর্ব ইতিহাস ভাল কিনা তা ভালো করে জেনে নিন।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় প্রাণিটিকে একটি আয়তক্ষেত্রের মত হতে হবে।

৩. মাথা ও গলা খাটো এবং চাওড়া হতে হবে।

৪. কপাল প্রশস্থ হওয়া আবশ্যক ।

৫. গায়ের চামড়া ঢিলে হওয়া উচিত্

৬. কাঁধ খুব পুরু ও মসৃণ হতে হবে।

৭. পিঠ চ্যাপটা অনেকটা মসতল এবং সোজা হবে।

৮. বুক প্রশস্থ ও বিস্তৃত হতে হবে।

৯. কোমরের দুই পার্শ্ব প্রশস্ত ও পুরু হবে।

১০. শরীরে হারে আকার মোটা হতে হবে।

১১. সামনের পা দুটো ও শক্ত সামর্থ হতে হবে।

১২. শিং খাটো ও মোট হওয়া বাঞ্চনীয় ।

১৩. লেজ খাটো হতে হবে।

১৪. স্বাভাবিক ভাবে প্রানিটি শারীরিক রোগ ত্রুটিমুক্ত হতে হবে।

১৫. বদ মেজাজী গরু ক্রয় করা উচিত নয়।

১৬. ষাঁড়/বলদ গরু হওয়া বাঞ্চনীয়।

১৭. যথাসম্ভব কম দামে পশু ক্রয় করতে হবে।

১৮. কোন অবস্থাতেই বৃদ্ধ গরু করা উচিত নয়।

বয়স : গবাদি প্রাণির বয়স ফার্ম থেকে ক্রয় করলে ফার্মের রেজিষ্ট্রার হতে পাওয়া যায়। এছাড়া গরু মালিকের নিকট থেকে তথ্য নিয়ে জানা যায়। বাছুর গরুর জন্ম গ্রহণের রেজিষ্ট্রার সংরক্ষিত না থাকলে গরুর দাঁত ও শিং এর রিং দেখে বয়স নির্ণয় করা যায়। গবাদিপ্রাণির যখন দুটি স্থান ইনসিজর দাঁত ওঠে তখন গরুটির বয়স হবে ১৯-২৪ মাস অর্থাৎ গরুর বয়স ২ বছর। এর পর প্রতি ৬ মাস অন্তর-অন্তর এক জোড়া করে স্থায়ী দাঁত গজায়। ২-২.৫ বছর বয়সের গরু সাধারণত মোটাতাজা করার জন্য নির্বাচন করা হয়। তবে ২-৩ বছর বয়সের গরু অথবা ২-৪ দাঁত বয়সের ষাঁড় গরু মোটাতাজাকরণের জন্য সবচেয়ে ভাল হয়।

দাঁত দেখে বয়স চেনার উপায়

- সামনের দাঁত পড়ে ২ টি স্থায়ী দাঁত উঠলে বয়স ২ বছর
- ৪টি স্থায়ী দাঁত উঠলে বয়স ২ বছর ৬ মাস
- ৬ টি স্থায়ী দাঁত উঠলে বয়স ৩ বছর
- ৮ টি স্থায়ী দাঁত উঠলে বয়স ৩ বছর ৬ মাস হতে ৪ বছর

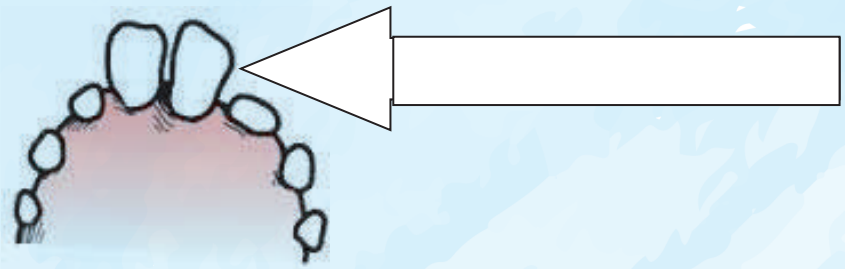

১৯. গাঢ় লাল বা লাল কালচে রংয়ের গরুর চাহিদা বাজারে সবচেয়ে বেশি
২০. কালো, বাদামি এবং ছাই রংয়ের গরুও ক্রয় বা নির্বাচন করা যেতে পারে। সাদা রংয়ের গরুর চাহিদা বাজারে তুলনামূলকভাবে কম।

জাত : উন্নত এবং সংকর জাতের গরু ক্রয় করতে পারলে সবচেয়ে ভাল। কারণ এ সব গরুর দৈহিক বৃদ্ধি এবং মাংস উৎপাদন অল্প সময়ে বেশি হয়।

মোটাতাজাকরণ উপযোগী বিভিন্ন জাতের গরুর বিবরণ।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গরু মোটাতাজাকরণ প্রকল্পের জন্য যে সব গরুর জাত সচরাচর পাওার যায় সেসব জাতের গরুর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো।

দেশীয় জাতের ষাঁড়

উৎপত্তি স্থল : বাংলাদেশের সর্বত্রই ও জাতের গরু পাওয়া যায়।

সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ

দেশী গরুর বর্ণ বা র্র বিভিন্ন ধরনে হয় : যেমন লাল, কাল, সাদা, ধুসর, সাদা কালো, ফ্যাকাশে লাল ইত্যাদি বর্ণের হয়।

- দেহের গঠণ বলিষ্ঠ ও আটসাট।
- এ জাতের গরুর পিঠে চুড়া বা কুচ থাকে।
- এ জাতের গরু উচ্চতায় বেশ খাটো।
- দেহের তুলনায় লেজ ছোট ও সরু।
- ষাঁড় গরু উগ্র স্বভাবের হয়।
- শিং মোটামুটি বড় ও কিছুটা লম্বা।
- এ জাতের এড়ে গরুর যৌন উত্তেজনা কিছটা বেশী থাকে।
- এ জাতের গরু যে কোন ধরনের সাধারণ মানের খাবার খেয়ে অভ্যস্থ।
- এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী।
- দেশী জাতের গরু মূলত পরিশ্রমী বলদ কৃষি কাজ ও ভার বহনের কাজে বেশী উপযোগী।
- একটি পূর্ণাঙ্গ বয়সের দেশী এড়ে গরুর ওজন গড়ে ১৫০-২০০ কেজি হয়।
- দেশী জাতরে গরুর মাংস বেশ সুস্বাদু।

ব্রাহমা

ব্রাহমা জাতের গরুর আদিবাস ভারত। প্রায় একশত বছর পূর্বে ভারত থেকে আমেরিকায় নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে আজ বিখ্যাত মাংসল জাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইহার নং সাধারনত ধুসর হয়ে থাকে । কখনো ককনো লাল ও হয়। এই জাতের গরুর পিঠে বলিষ্ঠ কুজ রয়েছে কান দুইটি বড় এবং ঝুলান চামড়া ঢিলে বেশ গরম সহ্য করতে পারে। তাই উষ্ণ মন্ডলী দেশের জন্য এই জাতের গরু ভাল এদরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী এবং সাধারন মাণের খাদ্য গ্রহনে অভ্যস্থ। ইহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিস্তারিতভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বণর্না করা হয়েছে।

সাধারন বৈশিষ্ট্য সমূহ

- পূর্ন বয়স্ক ব্রাহমা জাতের ষাড়ের ওজন ঃ ১০০০-১২০০ কেজি ।
- জন্ম কালীন বাচ্চার ওজন (বার্থ ওয়েট) ঃ ২৮-৩৫ কেজি।
- দুগ্ধকালীন (ওয়েনিং ওয়েট) ঃ ২৫০-৩৫০ কেটি।
- এক বছরে ওজন (ইয়ারলী ওয়েট) ঃ ৩৫০- ৪০০ কেজি।

আকার : মাংস উৎপাদনকারী জাতের মধ্যে ব্রাহমা জাত মাঝারী আকৃতির অনেক সময় পা লম্বা আকৃতির হয়ে থাকে।

স্বভাব : শান্ত প্রকৃতির, পরিশ্রমী ও বিভিন্ন ধরনে আবহাওয়ায় সহনশীল এবং বিভিন্ন ধরনের সাধারন মানের খাবার গ্রহণে অভ্যস্থ।

গায়ের রং : জন্মোর সময় বাছুরের রং হালকা ধুসর থেকে লাল আবার অনেক ক্ষেত্রে কালো হয়। প্রাপ্ত বয়স্ক ষাঁড় গরু সাদা ও কালো রংয়ের হয় এবং এদের ষাঁড় কাধ ও পায়ের নীচের দিকে বেশ গাঢ় দেয়া যায়। অনেক বাচ্চা জন্মের সময় লাল হলেও পরবর্তীতে ধুসর হয়ে যায়।

গায়ের লোম : গায়ের লোম খাট ও মোটা চকচকে। এজন্য এরা রোদের মধ্যে বেশী সময় থাকতে পারে।

চামড়া : চামড়া ঢিলা নরম এবং বর্ধিষ্ণু। যাযা কারণে বেশী গরম সহ্য করতে পারে।
মাথা, কুজ ও ওলানঃ মাথা সাধারনত লম্বা ওলান ঝুলে থাকে। শিং একদাম ছোট অথবা হালকা হতে পারে । ব্রাহমা জাতে ষাঁড় গরুর ক্ষেত্রে কুঁজ বড় হয এবং গাভীর ক্ষেত্রে কুজ একটু ছোট হয়। গাভীর ওলান এবং বাট মাঝারী আকৃতির হয়ে থাকে।

উৎপাদন দক্ষতা : ব্রাহমা জাত ভাল মাংস উৎপাদন দিতে সক্ষম এবং এর পিছনে মূল যে ভূমিকা রয়েছে তা হলো খাদ্য পরিপাক পদ্ধতি ।

সিন্ধি

উৎপত্তি স্থান : পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের করাচি লাসবেলা ও হায়দরাবাদ ।

সাধারন বৈশিষ্ট সমূহ

- গায়ের রং লাল বলে নাম লাল সিন্ধী
- ষাঁড়ের ওজন ৪২৫-৫০০ কেজি ।
- কপাল প্রসস্ত এবং উন্নত, কানের আকার মাঝারী নীচের দিকে ঝুলানো।
- শিং খাটো ও মোটা ।
- গায়ের রং সাধারনত ঃ গাঢ় লাল কিন্ত কালচে হলুদ হইতে গাঢ় মেটে রং এর হতে পারে ।
- মাংস উৎপাদনের জন্য এই জাতের গরু অত্যন্ত যুগোপযোগী।

রেড চিটাগাং

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের অর্থনতিতে গবাদীপ্রাণি বিশেষ করে গাভী পালনের গুরত্ব অপরিসীম। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরনে দুধ ও মাংসের বিরাট একটা অংশ আসে গবাদীপ্রাণি থেকে। ভৌগলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের চট্রগ্রাম বিভাগের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এই দিন পার্বত্য জেলা নিয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্রগ্রাম গঠিত। এই পার্বত্য অঞ্চলের গবাদিপ্রাণি বিশেষ করে রেড চিটাগাং গাভী পালনের জন্য খুবই উপযোগী স্থান।

পার্বত্য অঞ্চলে গরু পালনের বেশ কিছু সুবিধা আছে। রেড চিটাগাং বা লাল চিটাগাং গরু যা স্থানীয়ভাবে লাল চাটগা নামে পরিচিত । বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চলের বিভিন্ন যায়গায় লাল চিটাগাং গরু পাওয়া যায়। তবে বিশেষ করে লোহাজারী, চন্দানাইশ, পটিয়া, সাতকানিয়া এবং আনোয়ারাতে এই গরু বেশি পাওয়া যায়। এই জাতের গরু বৃহত্তর চট্রগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গেলেও দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও কদাচিৎ দেখা যায়।

সাধারন বৈশিষ্ট্য সমূহ

- এই জাতের গরুর প্রধান বৈশিষ্ট হলো এর গায়ের রং হালকা থেকে গাঢ় লালচে।
- ষাঁড়ের ওজন ২৭০ কেজি।
- এদরে চোখের পাপড়ি, শিং ও মাজেল বা নাকের সামনের মোটা অংশ লালচে।
- মুখ থুতনী/চিবুক, চোখের চারপাশ, পেটের তলদেশ ও খুর অপেক্ষাকৃত হালকা রঙের।
- গঠন খাট গোল গাল অথবা লম্বাটে হালকা পাতলা।
- মাথা ছোট ও হালকা পাতলা।
- শিং ঈষদ সাদা রংয়ের ছোট, পাতলা এবং ভিতরের দিকে আংশিক বাকানো।
- দুই শিংয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চল/স্থান উন্নত।
- কান খাড়া হালকা রঙের ।
- গল কম্বল উন্নত।
- ষাঁড় খুব তেজী স্বভাবের হলেও গাভীগুলি শান্ত স্বভাবের বিধায় সহজেই পরিচালনা করা সম্ভব।
- কুঁজ উন্নত।

ক্রিমি মুক্তকরণ

গবাদিপ্রানি ক্রিমিতে আক্রান্ত হবার লক্ষণ

- লোম উশকো খুশকো দেখা যায়
- খাওয়া দাওয়া কমে যায় বা খেলেও স্বাস্থ্য ভালো হয় না।
- রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয়।
- পাজরের হাড় দেখা যায়।
- গরু পাতলা পায়খানা করে।

সুস্থ গরুর লক্ষণ

- গরু পরিবেশের প্রতি সচেতন থাকবে।
- চোখ উজ্জল এবং টলটলে হবে।
- অবসরে জাবর কাটবে।
- সুস্থ গরুর নাকের নিচের কালো অংশ সবসময় বিন্দু বিন্দু ঘামে ভেজা থাকবে।

গরু গুলো কোন রোগে আক্রান্ত কিনা তা ভালভাবে পরীক্ষা করে সুষ্ঠু চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে হবে।
গরুর কে ডি-ওয়ামিং এর মাধ্যমে কৃমিমুক্ত করতে হবে। কারণ আমাদের দেশে প্রায় ১০০% গরুরই কৃমিতে আক্রান্ত হয় এ জন্য গরু ক্রয় করার পর অবশ্যই কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। এরপর ঐ গরুকে ৩ মাস পর পর পুনরায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। বাজারে বিভিন্ন ধরণের ব্রোড স্প্রেকটাম কৃমিনাশক ঔষধ পাওয়া যায়।

গরুর ক্রয় বা নির্বাচন করার পর সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে গরুর কে গোলকৃমি, পাতাকৃমির হাত হতে মুক্ত করা। বাজারে বিভিন্ন রকম ঔষধ পাওয়া যায়, এনডেক্স/লিভেক্স/রেনা ডেক্স । এই সকল ঔষধ থেকে যে কোন একটি ৭৫ কেজি ওজনের গরুর নির্দেশিত মাত্রায় আক্রান্ত প্রাণিকে শুধুমাত্র একবার খাওয়াতে হবে। সারা বৎসর ব্যাপী গরুরকে কৃমিমুক্ত রাখার জন্য নির্দেশিত মাত্রায় ৩ মাস পরপর খাওয়াতে হবে।
কৃমি আক্রান্ত গরুর সাধারণত ভিটামিনের অভাবে (ভিটামিন বি এর অভাবে) দূর্বল হয়ে পরে। তাই কৃমি মুক্ত করার পর ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইনজেকশন দিলে ভালো ফল পাওয়া যায়।
এই সময় গরুর রুচি বাড়ানোর জন্য এনোরা, এনরক্স, ইত্যাদি ওষুধ খাওয়ালে গরুর রুচি বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন ওৎন অনুপাতে ২/৩ টি করে ট্যাবলেট ৭ দিন খাওয়াবেন।
এছাড়া কৃমিনাশক প্রয়োগের ১ সপ্তাহ পর থেকে Metaphos/Toposal/Catasol injection প্রয়োগ করলে গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যাবে।

গরুর দৈহিক ওজন রেকর্ডকরণ

এই প্রকল্পে গরুর ওজন নিয়মিত রেকর্ড করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রকল্প চালুর শুরুতে ক্রয়কৃত সবগুলো গরুর ওজন পৃথক পৃথক ভাবে রেকর্ড করতে হবে এবং ১৫ দিন পর পর প্রতিটি গরুর ওজন খাবার সরবরাহের সঙ্গে বৃদ্ধি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করা যায়। তাতে পালনের অগ্রগতি বুঝা যায়। প্রকৃত গরুর ওজন নির্ণয় করার জন্য ব্যালান্স ব্যবহার করাই উত্তম। তবে সহজ ১টি ফরমুলাতে গরুর ওজন বের করা যায়। ইহাতে গরুর সঠিক ওজনের কাছাকাছি পাওয়া যায়। ক্লথ টেপের সাহায্যে প্রাণির দৈর্ঘ্য ও বুকের মাপ নেওয়া হয়।

$$\text{গরুর ওজন} = \frac{\text{দৈর্ঘ্য(ইঞ্চি)} \times (\text{বুকের বেড়})^2 \text{ (ইঞ্চি)}}{৬৬০} = \text{কেজি}$$

গরুর দৈর্ঘ্য = গরুর লেজের উপরের পিন পয়েন্ট থেকে অথবা পাছার উঁচু হাড় হতে সোল্ডার পয়েন্ট বা গলার মাঝ বরাবর পর্যন্ত

বুকের বেড় = সামনের ২ পায়ের ঠিক পিছনের দিক বরাবর।

গরুর বুকের বেড় থেকেও গরুর দৈহিক ওজন নির্ণয় করা যায় তা নিচে টেবিলে দেখানো হলো

বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)
২৫	১৯	৩৯	৬৪	৫৩	১৬২
২৬	২০	৪০	৬৯	৫৪	১৭১
২৭	২১	৪১	৭৩	৫৫	১৮১
২৮	২৩	৪২	৭৮	৫৬	১৯১
২৯	২৫	৪৩	৮৩	৫৭	২০০
৩০	২৭	৪৪	৮৭	৫৮	২১০
৩১	৩০	৪৫	৯২	৫৯	২১৯

বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)	বুকের বেড় (ইঞ্চি)	দৈহিক ওজন (কেজি)
৩২	৩২	৪৬	৯৬	৬০	২২৯
৩৩	৩৫	৪৭	১০১	৬১	২৩৪
৩৪	৩৯	৪৮	১১৩	৬২	২৪৭
৩৫	৪৩	৪৯	১২৩	৬৩	২৫৬
৩৬	৪৯	৫০	১৩৩	৬৪	২৬৫
৩৭	৫৪	৫১	১৪৩	৬৫	২৭৫
৩৮	৫৯	৫২	১৫২	৬৬	২৮৬

গরুর ওজন রেকর্ড এর মাধ্যমে ঐ গরুর দৈনিক মাংস বৃদ্ধির পরিমাণ জানা যায়। এটি নির্ণয় করার জন্য নিম্নের ফরর্মুলা ব্যবহার করা হয়।

গরুর দৈনিক মাংস বৃদ্ধির পরিমান দাঁড়াল প্রকল্পের গরুর বিক্রয় করার সময় ওজন- প্রকল্প শুরুর সময় গরুর ওজন

= ..... সময়ের ব্যবধান (দিন)

উদাহরন

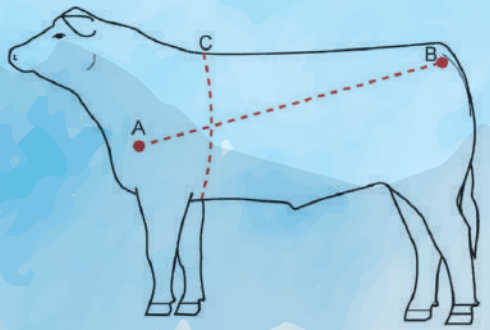

সূত্র : $\frac{\text{দৈর্ঘ্য} \times (\text{বুকের বেড়})\ ২}{৬৬০}$ কেজি

(ধরি একটি গরুর দৈর্ঘ্য = ৪২ ইঞ্চি এবং বুকের বেড় = ৪৫ ইঞ্চি)

তাহলে গরুর ওজন হবে =

$$\frac{৪২ \times ৪৫ \times ৪৫}{৬৬০} \text{ কেজি}$$

$$\frac{৪২ \times ২০২৫}{৬৬০} \text{ কেজি}$$

= ১২৮.৮৬ কেজি ----- ১২৯ কেজি

এর খাওয়ার যোগ্য মাংসের পরিমাঃ (১২৯ এর ৬০%=৭৭.৪০ কেজি)

গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ এবং তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা

পাঠপরিকল্পনা

উদ্দেশ্য

- গরু বিভিন্ন রোগের নাম এবং রোগসমূহের লক্ষণ জানা।
- গরু বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যাবস্থাপনা সম্পর্কে জানা।

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ২.৫ ঘন্টা

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক

সহায়তাকারী দিনের অলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।
সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ এবং তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন।
সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ এবং তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিষয়ে জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- গরু কি কি রোগ হতে আপনারা দেখেছেন ?
- গরুর কোন বয়সে রোগ বেশি হয় ?
- গরুর রোগ হলে কি কি করেন ?

সহায়তাকারী এখন গরু বিভিন্ন রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ আলোচনা করবেন । তথ্য প্রদান হবে অংশগ্রহণমূলক। এটি একক কোন বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে নয়। আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সদস্যদেরকে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে আলোচনায় সংযুক্ত করতে হবে। গরুকে সামনে রেখে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেত পারে।

- সুস্থ গরু চিনতে হলে কি কি বিষয় গুলো খেয়াল রাখতে হবে?
- গরুতে কি কি রোগ হতে পারে?
- খুরা রোগ, তড়কা, বাদলা, গলাফুলা রোগের লক্ষণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ কি কি?
- গরুর কৃমি াক? ক্রিমিতে গরু আক্রান্ত হলে আপনারা কি করেন
- ক্রিমি কত প্রকার ও কি কি ?
- টিকা কি? গরু মোটাতাজাতরণ এ গরুকে কি কি টিকা দিতে হবে?
- কোথায় কোথায় টিকা পাওয়া যায়?
- কারা টিকা প্রদান করে থাকেন?

সহায়তাকারী সেশনেরাত পূর্বে সংগৃহীত গরু কে সবার সামনে নিয়ে আসবেন এবং সুস্থ গরু চিনতে বা নির্ণয় করতে হয় তা হাতে কলমে করে দেখাবেন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে টিকা ও বিভিন্ন ওষুধের নমুনা প্রদর্শন করবেন। এছাড়াও বিভিন্ন পরজীবি সংগ্রহ করে হাতে কলমে দেখাবেন।

আলোচনার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে;

- গরুর সুস্থতার লক্ষণ কি কি ?
- টিকার নাম কি জানতে চাইবেন ।
- বিভিন্ন পরজীবির নাম ও এদের ক্ষতিকারক দিক গুলো কি কি হতে পারে জানতে চাইবেন।

কারিগরি নোট

তড়কা (এনথ্রাক্স)

একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ।

লক্ষণ

- গরুর প্রচন্ড জ্বর ওঠে (১০৬০-১০৮০ ফারেনহাইট)
- গরু কাঁপতে থাকে
- পেট ফুলে যায়
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পূর্বেই গরু মারা যায়
- মরা গরুর প্রসাব পায়খানার রাস্তা এবং বিভিন্ন ছিদ্র পথ দিয়ে আলকাতরার রক্ত মত বের হয়।
- পেট ফুলে উঠে এবং মৃতদেহ দ্রুত পচন ধরে।

গরু মারা যাবার পর করণীয়ঃ তুলা দিয়ে সকল ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিতে হবে। চামড়া খোলা যাবে না। ৬ ফুট মাটির নিচে চুন দিয়ে মাটি চাপা দিয়ে উপরে চুন ছিটিয়ে দিতে হবে। গরু থেকে মানুষে ছড়ায় বলে মানুষ বেশি আতঙ্কিত থাকে।

প্রতিরোধ : জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে হবে। তরকা রোগের টিকা দিতে হবে।

বাদলা :

ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। দুই বৎসর বয়সের কাছাকাছি স্বাস্থ্যবান গরুগুলোতে এ রোগ বেশি দেখা যায়।

লক্ষণ :

- স্বাস্থ্যবান গরু হঠাৎ খুঁড়িয়ে হাটে
- পায়ের যেখানে মাংস থাকে সেখানে ফুলে উঠে
- গায়ে প্রচন্ড জ্বর থাকে, তখন ধরা যায় না। ১০৬০-১০৭০ ফারেনহাইট
- ফোলা জায়গায় চাপ দিলে পচ পচ শব্দ হয়।
- এই রোগকে এলাকাভেদে ভসভসি/ কলাগাছিয়া/পচামিনা রোগ বলে। ৮০-৯০% মারা যায়।
- রোগের স্থায়ীত্ব ২৪ ঘন্টা।

প্রতিরোধ : জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও টিকা দিতে হবে।

চিকিৎসা : যে কোন এন্টিবায়টিক ইনজেকশন ক্ষত স্থানের চারদিকে পুশ করতে হবে।

গলা ফুলা :
যে কোন বয়সের গরুর হতে পারে। এটি একটি ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ।

লক্ষণ :

- প্রচন্ড শ্বাস কষ্ট হয়। থুতনির নিজ থেকে গলা পর্যন্ত ফুলে যায়।
- ফোলা যায়গায় হাত দিয়ে চাপ দিলে বসে যায় এবং গরম অনুভূত হয়।
- নাক ও মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- গায়ে প্রচন্ড জ্বর থাকে (১০৬-১০৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট)
- ৮০-৯০% গরু মারা যায়।
- শ্বাস কষ্ট দেখা দেয়।

প্রতিরোধ : জীব নিরাপত্তা ও টিকা দিতে হবে।

ক্ষুরা রোগ : এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ।

লক্ষণ :

- মুখে ও পায়ে ঘাঁ হয়।
- গায়ে জ্বর থাকে (১০৪-১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট)
- পায়ের ক্ষুরায় ঘাঁ এর কারণে গরু খুঁড়িয়ে হাটে।
- মুখে ঘাঁ হয়ে মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- র্দুগন্ধ আসে,

প্রতিকার : পটাশের পানি দিয়ে সুন্দরভাবে ধুঁয়ে ফেলতে হবে, এবং এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন দিতে হবে। রসুন সরিষার তেলের সাথে গরম করে বা তারপিন তেল ঘাঁ এর আশে পাশে দিতে হবে যাতে মাছি না পড়ে।

প্রতিরোধ : জীব নিরাপত্তা ও টিকা দিতে হবে।

ওলান প্রদাহ :
যত প্রকার জীবাণু আছে সকল প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যে গরুর দুধ বেশি হয় সেই গরুর এই রোগ বেশি হয়।

লক্ষণ

- গাভির ওলানের অথবা দুধের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অস্বভাবিক অবস্থা হওয়াই হল ওলান প্রদাহের লক্ষণ।
- গাভির দেহে জ্বর থাকতে পারে ওলান ব্যথাযুক্ত ফোলা থাকে।
- দুধের রং, গন্ধে যে কোন পরিবর্তন হতে পারে।
- এ রোগে আক্রান্ত হলে ৭০% পর্যন্ত দুধ উৎপাদন কমে যায়।

ওলান প্রদাহ প্রতিরোধের জন্য কিছু ব্যবস্থাপনা

- প্রথমে প্রথম বাচ্চা দানকারী, তারপর সুস্থ ও ভাল গাভি, এরপর চিকিৎসা প্রদান করে রোগমুক্তিপ্রাপ্ত এবং সর্বশেষে
- আক্রান্ত গাভি দোহন করতে হবে।
- প্রতি গাভি দোহনের আগে ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- দোহনের আগে জীবাণুনাশক দিয়ে ওলান ও বাঁট ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এবং দোহন শুরু করার
- আগে দু চার ফোটা দুধ ফেলে দিতে হবে।
- দোহনের আগে ও পরে জীবাণুনাশক দিয়ে বাঁট পরিষ্কার করে ধুয়ে ফেলা ভাল।
- দোহনের পরপরই খাবার দিতে হবে যেন দুই ঘন্টা পর্যন্ত গরু বসতে বা বাট মাটির সংস্পর্শে আসতে না পারে।

দুধজ্বর

- গাভীর শরীরে ক্যালসিয়াম এর অভাবে এ রোগ হয়।

লক্ষণ

- খাদ্য কম খায়। উত্তেজনা দেখা যায়।
- মাথা কাঁপতে থাকে, হাটতে গেলে কাত হয়ে পড়ে।
- দেহের এক পার্শ্বে মাথা গুজে শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ

ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য (যেমন: ডিসিপি, শামুক ঝিনুক গুড়া) খাওয়াতে হবে (কমপক্ষে গর্ভের শেষের তিন মাস এবং বাচ্চা প্রসবের পর প্রথম তিন মাস)।

কৃমি

- পাতলা পায়খানা থাকবে
- ঘাস কম খায়
- গরু শুকিয়ে যায় এবং ওজন কমে যায়
- লোম উশকোখুশকো হয়ে যায় এবং দেহের উজ্জলতা কমে যায়।

কৃমির ক্ষতির ধরণ : গরু যে খাবার খায় সেই খাবারের মধ্যে ভাগ বসায়।

প্রতিরোধ : প্রতি ৩ মাস পর পর কৃমির ঔষধ খাওয়ানো উচিৎ এবং জলাশয়ের কাছের ঘাস ভালো করে ধুয়ে খাওয়াতে হবে।

ইউরিয়া বিষক্রিয়া

- শ্বাস প্রশ্বাসে ইউরিয়ার গন্ধ আসবে।
- অস্থির ভাব থাকবে।
- পেটে ব্যাথা থাকবে।
- পিছনের পা দিয়ে জোরে জোরে পেটে লাথি মারবে।

করণীয়

- ভিনেগার খাওয়াতে হবে।
- তেঁতুল গুলিয়ে খাওয়াতে হবে।

করণীয়

- ভিনেগার খাওয়াতে হবে।
- তেঁতুল গুলিয়ে খাওয়াতে হবে।

আঠালী বা উকুন

উকুন, আঠালী অথবা কাঁধে ঘা এর জন্য আইভারম্যাকটিন ইনজেকশন ৫০ কেজি ওজনের গরুর জন্য ১ সি.সি চামড়ার নিচে দিতে হবে। দ্বিতীয় বার ২১ দিন পরে আবার দিতে হবে।

পেট ফোলা

ডাল জাতীয়, ধান, গম, চাল অথবা কচি ঘাস বেশি খাইলে পেট ফোলা রোগ দেখা দিতে পাওে এবং ১২-১৪ ঘন্টার মধ্যে মারা যেতে পারে।

লক্ষণ

- পেট ফুলে যাবে
- আস্তে আস্তে বড় হবে
- মাটিতে লুটে পড়বে
- মারা যাবে

প্রতিরোধ : তিষির তৈল ১ লি: + তারপিন তৈল ৬০ মিলি মিশ্রিত করে খাওয়াতে হবে অথবা আদার রস খাওয়ানো যেতে পারে। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর ঔষধ যেমন: জাইমোভেট, এপিভেট, ডিজিটপ ইত্যাদি ঔষধ পেট ফুলার জন্য খুবই কার্যকরী।

গরুর টিকা প্রদানের শিডিউল

রোগের নাম	ভ্যাকসিনের নাম	পরিমাণ	১ম বার দেওয়ার বয়স	২য় বার	কত দিন পর পর পুনরায় দিতে হবে
বাদলা	B.Q	৫ সি.সি.	৩ মাস বয়সে	২১ দিন	১ বছর
খুরা রোগ	FMD	৬ সি.সি.	৪ মাস বয়সে	৬ মাস	১ বছর
তরকা	Anthrax	১ সি.সি.	৬ মাস বয়সে	-	১ বছর
গলাফোলা	HS	২ সি.সি.	৬ মাস বয়সে	-	১ বছর

ছাগল/ভেড়ার বিভিন্ন রোগ

- **পি.পি.আর :** ইহা একটি ভাইরাস জনিত রোগ। পিপিআর একটি মারাত্তক সংক্রামক রোগ। এ রোগের জীবাণু
- ছাগলের দেহে প্রবেশের ৪-৫ দিন পর লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে নিম্নলিখিত লক্ষণসমূহ দেখা যায়।
- ঝিম ধরে ও পেটে ব্যথার জন্য পিঠ বাঁকা করে দাড়িয়ে থাকে।
- নাক, মুখ ও চোখ দিয়ে তরল নিঃসরণ হয়।
- শরীরের তাপমাত্রা ১০৪-১০৫ ডিগ্রি ফাঃ পর্যন্ত বেড়ে যায় ও ৪-৫ দিন পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ধীরে ধীরে তাপমাত্রা
- কমতে থাকে। পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া শুরু হয়। মলের রং হয় গাঢ় বাদামি। মাঝে মধ্যে রক্ত মিশ্রিত আম থাকতে পারে।
- ব্যাপকভাবে নিউমোনিয়া দেখা যায় এবং নাকের পথ বন্ধ হয়ে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়।
- রোগ শুরু হওয়ার সাথে সাথে চিকিৎসা করানো না হলে ৩-৮ দিনের মাথায় ছাগল মারা যায়।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত ছাগলকে চিকিৎসা করে খুব একটা ভাল ফল পাওয়া যায় না ।
- এন্টিবায়োটিক-ষ্ট্রেপটোমাইসিন ৫ সিসি করে এবং গাট অ্যাকটিং হিসাবে Sulfadimidin - ১/২ bolus ৩-৫ দিন ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- পানি শূন্যতা পূরণের জন্য স্যালাইন খাওয়াতে হবে।

প্রতিরোধ

- বাচ্চার তিন মাস বয়সে ১ এম এল চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে ১ বছর পর পর প্রয়োগ করতে হবে। গর্ভবস্থায় ও টিকা দেয়া যায়। তবে গর্ভের মাঝামাঝি অবস্থায় দেয়া ভাল।
- কৃমিঃ বিভিন্ন ধরণের কৃমি দ্বারা ছাগল/ভেড়া আকান্ত হতে পারে। এ গুলো অন্তঃপরজীবী। ছাগলের দেহের খাবারে ভাগ বসিয়ে এরা প্রাণিকে দুর্বল করে দেয়। তাই সকল ছাগলকে ৩ মাস পরপর নির্ধারিত মাত্রায় কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে।

রোগের লক্ষণসমূহ

- ক্ষিধে কমে যায়, ছাগলের লোম উশকো-খুশকো হয়ে যায় এবং ছাগল শুকিয়ে যায়।
- বদ হজম হয়। বদহজম হওয়ার কারণে ছাগলের চিরাচরিত গুটির মত পায়খানা হয় না।
- চোয়াল ও পেটের নিচের দিকে ফুলে যায়।

প্রতিকার

- প্রতি কেজি দেহ ওজনের জন্য ৪-৮ মি: গ্রা: পাইপেরজিন অথবা ৫-১০ মি: গ্রা: এলবেন্ডাজল।
- চ্যাপ্টা বা ফিতা কৃমির জন্য ১০-১২ মি: গ্রা:/ কেজি ফেনবেন্ডাজল।

প্রতিরোধ

- ঋতু ভিত্তিক কৃমিনাশক খাওয়ানো।
- জলাশয়ের কাছের ঘাস কম খাওয়ানো।

চর্মরোগ (নোনায় ধরা)

- সারকোপটিক বা সরোপটিক মাইট নামক একপ্রকার বহিঃ পরজীবি দিয়ে হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণসমূহ

- ছাগলের গায়ে প্রচন্ড চুলকানি হয়। চামড়ার লোম উঠে যায় এবং তা মোটা ও খসখসে হয়ে যায়।

প্রতিরোধ

- ছাগল এবং বাসস্থানের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা চর্মরোগ হতে ছাগলকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে এবং জৈব
- নিরাপত্তা বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে।

চিকিৎসা

- ছাগলকে ০.৫% ম্যালাথিয়ন দ্রবনে ২-৩ দিন পরপর ডিপিং/গোছল করাতে হবে।
- আইভারম্যাকটিন জাতীয় ইঞ্জেকশন বা ড্রপ ব্যবহার করেও বহিঃ পরজীবি দমর করা যায়।

ক্ষুরারোগ :

- এটি একটি ভাইরাসজনিত রোগ।

লক্ষণ

- মুখে জিহ্বা এবং পায়ের খুরার ফাঁকে ঘা দেখে খুব সহজেই বুঝা যায়।
- পায়ের খুরায় ঘা হওয়ায় হাটতে পারে না।
- মুখ দিয়ে লালা পড়ে।
- জ্বর হয় (১০৫-১০৬ ডিগ্রি ফা.)।
- প্রাণি কিছু খেতে পারে না। দুধ উৎপাদন কমে যায়।

প্রতিরোধ : এফএমডি টিকা প্রদানের মাধ্যমে।

প্রতিকার :

- দ্বিতীয় পর্যায়ের সংক্রামক ব্যাকটেরিয়ার হাত থেকে রক্ষার জন্য এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হবে।
- পটাশ অথবা খাবার সোডা পানিতে মিশিয়ে মুখ এবং খুরার মাঝের ঘা ধুয়ে দিতে হবে।
- মাছি যাতে ঘায়ে না বসতে পারে তাই ঘায়ের আশেপাশে তারপিন তেল অথবা রসুন ছেচে সরিষার তেলের সাথে হালকা গরম করে লাগানো যেতে পারে।

তড়কা রোগ : ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ

লক্ষণ

- শরীরের তাপমাত্রা অনেক বেড়ে যায়।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই প্রাণি মারা যায়।
- মরা প্রাণির পস্রাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে আলকাতরার মত কালো রক্ত বের হয়।
- পেট ফুলে ওঠে ও মৃতদেহে দ্রুত পচন ধরে।

প্রতিকার

- খুব তাড়াতাড়ি এন্টিবায়োটিক ইঞ্জেকশন দিতে হবে।
- একজন অভিজ্ঞ ভেটেরিনারি সার্জনের পরামর্শ নিতে হবে।

প্রতিরোধ

- বছরে একবার টিকা প্রদান করতে হবে।

টিকার নাম	প্রয়োগ মাত্রা	প্রয়োগ পদ্ধতি	দেওয়ার বয়স	মন্তব্য
পিপিআর	১ মিলি	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	৩ মাস বয়সে	প্রতি বছর
ক্ষুরা রোগ	২ মিলি	চামড়ার নিচে ইনজেকশন	৬ মাস বয়সে	প্রতি বছর
কৃমি	প্রস্তুতকারকের নিয়ম অনুযায়ী	খাওয়াতে হবে	৩ মাস	প্রতি ৩ মাস পরপর

টিকা প্রদান

রোগের নাম	ভ্যাকসিনের নাম	পরিমাণ	১ম বার দেওয়ার বয়স	কত দিন পর পর পুনরায় দিতে হবে
বাদলা	বি. কিউ	৫ সি.সি.	৩ মাস বয়সে	৬ মাস অন্তর
খুরা রোগ	এফ.এম.ডি	৬ সি.সি.	৪ মাস বয়সে	৪ মাস অন্তর
তরকা	এনথ্রাক্স	১ সি.সি.	৬ মাস বয়সে	১ বছর
গলাফোলা	গলাফোলা	২ সি.সি.	৬ মাস বয়সে	১ বছর অন্তর

দুগ্ধজাত গাভীর বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে প্রাপ্য বিভিন্ন শংকর জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্যাবলী ও কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক প্রজনন নিয়ে আলোচনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের দেশে গাভী পালনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফলন না পাওয়ার যে কয়টি কারণ আছে তার মধ্যে অনুন্নত সঠিত জাত নির্বাচন প্রজনন ব্যবস্থাপনা। সঠিক গাভীর জাতের অভাবে উৎপাদন অনেক কমে যাচ্ছে এবং কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে দিনে দিনে গরু পালনে কৃষকদের আগ্রহ কমে যাচ্ছে। এই জন্য গরু জাত নির্বাচন ও কৃত্রিম প্রজনন সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

- আদর্শ গাভীর জাত ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষন করতে পারবেন
- গাভী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমুহ চিহ্নিত করতে পারবেন
- সুস্থ সবল গাভী সনাক্ত করতে পারবেন
- দুগ্ধ উৎপাদনকারী জাত সম্পর্কে জানতে পারবেন
- বাংলাদেশে প্রাপ্য বিভিন্ন শংকর জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে জানতে পারবেন
- গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত কি ও কেন

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ : ম্যানিলা পেপার, মার্কার, বিভিন্ন দুগ্ধজাত গরুর ছবি।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গরুর গাভীর জাত ও বৈশিষ্ট্য ও গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- আদর্শ গাভীর বৈশিষ্ট্য কি কি ?
- গাভী ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় সমুহ কি কি ?
- আমাদের দেশের জন্য উপযোগী গাভীর জাত গুলো কি কি ?
- সুস্থ সবল গাভী সনাক্ত কি ভাবে করা যায় ?
- কৃত্রিম প্রজনন কি ?
- কৃত্রিম প্রজননের উপযুক্ত সময় কখন ?
- কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা ?
- কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা ?
- ইনব্রিডিং কি ? এটি কয় ধরণের ?
- গাভীর গরম হওয়া লক্ষণ ও প্রজননের উপযুক্ত সময় কোনটি ?
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন।
- কিভাবে কৃষকদের বর্তমানের গরুর জাত এবং প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিন।
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন ।

কারিগরী নোট

দুগ্ধ জাতের গাভী নির্বাচনের বৈশিষ্টাবলী

কথায় বলে যে "যেমন মা তেমন ছা"। তাই দুধাল জাতের গাভী নির্বাচনের বংশ ইতিহাস জানা দরকার । শরীর বেশ বড় আকারের হবে। গায়ের রং উজ্জ্বল ও পশম গুলো মসৃণ হবে। পা চিকন ও লম্বা হবে। গলকম্বল বড় ও ঝুলে থাকবে, পা মজবুত ও ফাঁক করে দাড়িয়ে থাকবে। চোখ উজ্জ্বল ও নাকের অগ্রভাগ ঘর্মাক্ত থাকবে। ওলান আকারে বেশ বড় কিন্তু ওলানে যখন দুধ থাকবে না তখন সংকুচিত হয়ে যাবে। দেহের সাথে শক্ত ভাবে লাগানো থাকবে এবং গঠন সুন্দর হবে। বাটগুলো বড় বড় ও সমান দুরে দুরে বিস্তৃত থাকবে। প্রতিটা বাট একই আকারের ও দোষ মুক্ত হবে। গাভী শান্ত স্বভাবের হবে, লেজ লম্বা ও লেজের গুচ্ছ বড় থাকবে। শির দাড়া সোজা হবে। দেহের সামনের অংশ সরু ও পিছনের দিকে ভারী হবে। দুধ শিরা গুলি আকা বাকা হবে এবং দুর থেকে স্পষ্ট দেখা যাবে। প্রতি বছরই বাচ্চা প্রসব করবে। উন্নত জাত ও অল্প বয়সের হতে হবে ।

যেসব গাভী সন্তোস জনক পরিমাণে নিয়মিতভাবে দুধ দেয় তাদের দুগ্ধবতী গাভী বলা হয়। দুগ্ধবতী গাভীর শুষ্ক বা গর্ভবতী অবস্থায় কতিপয় বৈশিষ্ট্য দেখে এরা দুগ্ধবতী কিনা তা বোঝা যায়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় ভাল জাতের দুদেল গাভী নির্বাচনে নিম্নোক্ত বৈশিস্ট্যসমুহ বিবেচনা করলে অধিক উৎপাদনক্ষম গাভী বাছাই করে ক্রয় করা যায়।

১। দেহ গঠন :

- বৃহৎ দেহ, ঝুড়ি পেট, শিথিল পা, চওড়া কপাল ও ছোট মাথা উৎকৃষ্ট দুগ্ধ জাতের বৈশিষ্ট্য।
- ভাল জাতের গাভীর শরীরের চামড়া পাতলা, নরম ও আলগা থাকে।আর ত্বকে থাকে চাকচিক্য।
- বুক বেশ গভীর ও প্রশস্থ হয়।
- সামনের ও পিছনের পা দুটোর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক থাকে। পেছনের পা সামনের পায়ের চেয়ে বড় থাকে।
- গাভীর মুক গহবর ও নাসিকা গহবর প্রমস্ড় হয়।
- উৎকৃষ্ট গাবীর চোখ উজ্জ্বল। দেহ অতিরিক্ত মাংস ও চর্বিবহুল হবে না।

২। গোঁজ আকৃতির দেহ :

- ভাল জাতের গাভীর পিছনের দিক সামনের দিক অপেক্ষা প্রশস্থ। তাই উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীকে পিছনের দিক থেকে গোঁজাকৃতি দেখায়।
- প্রশস্থ চওড়া পাছা ও পিছনের পা দুটোর মদ্যে ফাঁক উৎকৃষ্ট গাভীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পিছনের পা দুটোর মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক থাকলে ওলান বড় হওয়ার সুযোগ থাকে।

৩। ওলান ও বাঁট :

- উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর ওলান বেশ বড়, চওড়া, মেদহীন ও কক্ষগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে।
- ওলান সামনে ও পিছনে সমভাবে প্রসারিত থাকবে।

ওলানের পিছন দিক সুডৌল ও প্রশস্থ হয় এবং পাশ থেকে ওলানের তলদেশ সমতল দেখায়।

উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর ওলান স্পঞ্জের ন্যায় নরম থাকে যা দুধ দোহনের পূর্বে বড় দেখায় এবং দুধ দোহনের পরে সংকুচিত হয়ে ঝুলে থাক।

অধিক মাংসল ও চর্বিযুক্ত ওলান ভাল নয়। এরুপ ওলানে দুধ ধারনের জায়গা খুব কম থাকে।

এছাড়া উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর বাটগুলো প্রায় একই মাপের এবং সমান দুরে থাকে ও সামগ্রিকভাবে চতুস্কোনের মত সাজানো থাকে। এছাড়া দুধের বাঁটের আকার দোহন উপযোগী হওয়া বাঞ্জনীয়।

৪। দুধের শিরা :

উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীর পেটের নীচে ওলানের সংগে সংযুক্ত সুস্পষ্ট শাখ প্রশাখা যুক্ত দুধের শিরা থাকে।

৫। প্রকৃতি :

দুগ্ধবতী গাভী শান্ত, ধীরস্থির ও মাতৃভাবাপন্ন হয়।

উত্তম দুগ্ধবতী গাভী ভীতু প্রকৃতির হয়। তবে দুধ দোহনের কালে অস্থিরতা প্রকাশ করে না। এদর চলাচলও ধীর ও মন্থর প্রকৃতির হয়।

৬ । বয়স :

সাধারণত : একটি গাভী প্রায় ১০ বছর পর্যন্ত বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন করে। সুতরাং গাভীর বয়স জানা আবশ্যক। এছাড়া গাভীর প্রথম প্রসবে যেসব বিপদের সম্ভাবনা থাকে সেগুলো একবার প্রসবের পর দূর হয়ে যায়।

৭। দুধ উৎপাদন :

পর্যাপ্ত দুধ উৎপাদনকারী গাভী উৎকৃষ্ট হিসাবে বিবেচিত হয়। তবে অনেক গাভী দুধ বেশি দিলেও অনেক সময় পাতলা হয় এবং ফ্যাট বা চর্বির পরিমান কম থাকে। সুতরাং দুধে ফ্যাটের পরিমান যাচাই করে গাভীর উৎকৃষ্টতা বিচার করা প্রয়োজন। স্বাভাবিক ফ্যাটযুক্ত দুধ ঘন ও ঈষৎ হলদে বর্ণের হয়।

সাধারণত: কোন নির্দিষ্ট এলাকার একই রকম চেহারা, আকার, বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী প্রাণীসমুহকে জাত বলে। বিভিন্ন জাতের প্রাণী বিভিন্ন রকমের, এদের আকার গুনাবলী, অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জাতের প্রাণীকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। গরু বাছুরের বেলায় এইসব গুণাবলী বা বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে দুগ্ধ উৎপাদন কারী জাত, মাংস উৎপাদনকারী জাত, ভারবহনকারী জাত, উভয় কাজে ব্যবহৃত জাত ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

- দুগ্ধ উৎপাদনকারী জাতঃ হলষ্টেইন ফ্রিজিয়ান, জার্সি, ব্রাউন সুইচ, লাল সিন্ধি, শাহীওয়াল ইত্যাদি।
- মাংস উৎপাদনকারী জাতঃ সর্ট হর্ন, সাসেক্স, হেয়ারফোর্ড, এবারডিন অ্যাংগাস, বিফ মাষ্টার ইত্যাদি।
- ভারবহন কারী জাতঃ অমৃত মহল, হালিকর, মালভী ইত্যাদি।
- উভয় কাজে ব্যবহৃত জাতঃ হারিয়ানা, থারপারকার ইত্যাদি।

গাভী যে সব কারণে নির্বাচন থেকে বাদ যাবে

- কম উৎপাদন শীলতা ।
- প্রজনন সমস্যা ।
- ভগ্ন ওলান/ওলান ফুলা রোগ ।
- পায়ের সমস্যা ।
- অন্যান্য স্বাস্থ্যগত সমস্যা ।
- দূর্বল শারীরিক গঠন, দুধ দোহনে সমস্যা, রাগান্বীততা ।

বাংলাদেশে প্রাপ্য বিভিন্ন শংকর জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্যাবলী

১। হলিষ্টিন-ফ্রিজিয়ান

হল্যান্ডের ফ্রিজল্যান্ড প্রদেশ থেকে উৎপত্তি। গায়ের রং সাদা কালো মিশ্রিত ও চুটি বিহীন। দেহের মধ্যে ও পিছনের অংশ ভারী। লম্বা ও অপেক্ষকৃত শরু মাথা। ওলান বেশ বড়। গাভীর ওজন ৫৫০-৬৫০কেজি, ষাঁড়- ৮০০-৯০০ কেজি, বাছুরের ওজন ৪৫ কেজি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ৬০০০-৭০০০ লিটার, দুধের চর্বি- ৩.৫% ।

২। জার্সি

ইংল্যান্ড, আমেরিকা থেকে উৎপত্তি। গায়ের রং ফিকে লাল। জিহবা ও লেজের রং কাল বা সাদা। দেহের গঠন সুন্দর, শিড় দাঁড়া সোজা । গাভীর ওজন ৪০০-৫০০কেজি, ষাঁড়- ৬০০-৮৫০ কেজি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ৪৫০০ লিটার, দুধের চর্বি- ৪.৫-৫% ।

৩। শাহীওয়াল

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে উৎপত্তি। গায়ের রং বাদামী লাল বা হালকা হলুদ, মাথা খাট কপালের স্থান উচু, চুট ও গলকম্বল বেশ বড়। গাভীর ওজন ৪৫০-৫৫০কেজি, ষাঁড়- ৬০০-১০০০ কেজি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ৩০০০ লিটার, দুধের চর্বি- ৪.৫% ।

৪। লাল সিন্ধি

পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশে উৎপত্তি। গায়ের রং গাড় লাল, কপাল প্রসস্ত, কান নিচের দিকে ঝুলানো, শিং/ঘাড় খাট ও মোটা গাভীর ওজন ৩৫০-৪০০ কেজি, ষাঁড়- ৪৫০-৫০০ কেজি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ২০০০ লিটার, দুধের চর্বি- ৪.৫-৫% ।

৫। হরিয়ানা

ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব এ উৎপত্তি। গায়ের রং সাদা ও হালকা ধুসর। মাথা বেশ লম্বা ও শরু, শিং লম্বা চিকন ও মসৃন। গাভীর ওজন ৪০০-৫০০ কেজি, ষাঁড়- ৬০০-৮০০ কেজি, বাৎসরিক দুধ উৎপাদন ১৫০০ লিটার, দুধের চর্বি- ৫% ।

গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নে কৃত্রিম প্রজননের গুরুত্ব

মানুষের শারীরিক ও মানুষিক বিকাশের জন্য দুধ ও মাংশ গ্রহণ একান্ত অপরিহার্য। একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ২৫০ মিলি দুধ, ১২০ গ্রাম মাংস গ্রহণ করা আবশ্যক। সেখানে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন দৈনিক ৫১ মিলি দুধ ও ২০ গ্রাম মাংস গ্রহণ করে । দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি হলে গুড়াদুধ আমদানী কমে যাবে। তাই দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়ন অত্যন্ত প্রয়োজন। দেশী গাভী দিনে ১-২ লিটার দুধ দেয়, অথচ শংকর জাতের গাভী দৈনিক ২৫-৩০ লিটার দুধ দেয়। আমাদের দেশে ১৯৭৫ সাল থেকে কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে খামারীদের মধ্যে ব্যপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত: কৃষি নির্ভর। কৃষির অন্যতম উপাদান হলো প্রাণিসম্পদ। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য দেশের গবাদিপ্রাণির জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল হিসেবে প্রাণিসম্পদের রয়েছে এক গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা। প্রাণিসম্পদ এদেশের গ্রামীন সমাজের গতিশীলতা প্রদানে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশীয় গাভীর দুধ উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ড় কম (গড়ে ১-২ লিটার/দিন)। এই অনুন্নত প্রাণিসম্পদ জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ১৯৫৮ সালে প্রাথমিকভাবে এদেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চালু হলেও ১৯৭৫ সালে এ কার্যক্রম সারাদেশে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়। এর ফলে বিভিন্ন উন্নত জাতের প্রজনন ষাঁড়ের বীজ দ্বারা দেশীয় গাভীর ক্রস ব্রিডিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত সংকর জাতের প্রাণিসম্পদ দুধ ও মাংস উৎপাদন অশানুরপ বৃদ্ধি পায়।

কৃত্রিম প্রজনন কি

কৃত্রিম প্রজনন হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে

- কৃত্রিমভাবে ষাঁড় থেকে বীর্য সংগ্রহ করা হয়
- সংগৃহীত বীর্যের গুনাগুন পরীক্ষা করা হয়
- বীর্যকে তরল করা হয় এবং
- যান্ত্রিক উপায়ে স্ত্রী জননতন্ত্রের নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমান বীর্য প্রবেশ করানো হয় ।

কৃত্রিম প্রজননের উপযুক্ত সময়

- বকনা বা গাভীর গরম অবস্থায় প্রধান কাজ হলো প্রজনন করানো।
- এজন্য প্রথমেই প্রজনন করানোর উপযুক্ত সময় নির্ণয় করতে হবে।
- সাধারনত: গাভী গরম হওয়ার লক্ষন প্রকাশ পাবার পর থেকে পরবর্তী ১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করালেই চলে।

- গরম অবস্থায় আসার শুরু থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করালে সফলতার হার হবে শতকরা ৪৫-৭০ ভাগ।
- ৭-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করালে শতকরা ৭০-৯০ ভাগ পর্যন্ত সফলতা পাওয়া যাবে।
- তবে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যাবে ১২ ঘন্টার সময় প্রজনন করালে।
- ১৮ ঘন্টার পর প্রজনন করালে ক্রমান্বয়ে সফলতার হার কমতে থাকবে।

কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা

- ভাল গুন সম্পন্ন ষাঁড়ের বীজ দিয়ে অতিদ্রুত ও ব্যাপক ভিত্তিতে উন্নত জাতের গবাদিপ্রাণি তৈরী করা সম্ভব ।
- ষাঁড় থেকে ১ বার সংগৃহীত বীজ দ্বারা ১০০-৪০০ গাভী প্রজনন করা যায় । ফলে ষাঁড়ের ব্যাবহার যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।
- বীজের গুনাবলী পরীক্ষা করা হয় বলে গর্ভধারনের সম্ভাবনা বেশী।
- ষাঁড় থেকে গাভীতে সংক্রামক রোগ (যেমন ট্রাইকোমোনিয়াসিস ,ভিব্রিওসিস ইত্যাদি) বিস্তার প্রতিহত করা যায়।
- কম খরচে অনেক বেশী গাভীকে পাল দেওযা যায়।
- ষাঁড়ের জন্মগত ও বংশগত রোগ বিস্তার প্রতিরোধ করা যায় ।
- সঙ্গমে অক্ষম উন্নত জাতের ষাড়ের বীজ সংগ্রহ করে তা ব্যবহার করা যায় ।
- যে কোন সময় যে কোন স্থানে সহজেই কৃত্রিম প্রজনন করা যায় ।
- উন্নত জাতের ষাঁড়ের বীজ সংগ্রহ করে পরবর্তীতে অনেক সময় পর্যন্ত ব্যবহার করা যায় ।
- অনেক সময় বড় আকারের ষাঁড় দিয়ে ছোট আকারের গাভীকে পাল দেওয়ায় অসুবিধা দেখা দেয় ।
- কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা এ অসুবিধা দুর হয় ।
- এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গাভী বা ষাঁড় পরিবহনের খরচ ও ঝামেলা পোহাতে হয় না ।

কৃত্রিম প্রজননের অসুবিধা

- দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অপারেটর এবং বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ।
- যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে পরিস্কার করা না হলে গাভীর গর্ভধারনের সম্ভাবনা কমে যায় ।
- প্রাকৃতিকভাবে পাল দিলে যে সময় লাগে তার চেয়ে এই পদ্ধতিতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়।

ইনব্রিডিং :- যে পদ্ধতিতে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত দুটি প্রাণীর মধ্যে মিলন ঘটিয়ে বংশধারা ও গুনাবলী অব্যাহত রাখা হয় তাহাকে ইনব্রিডিং বা আন্ত প্রজনন বলা হয় । এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনকারী প্রাণী পিতা মাতার ঘনিষ্ট রক্ত সম্পর্কযুক্ত হতে হয় ।

ইনব্রিডিং দুই প্রকার :

- ফুল সিব : আপন ভাই বোনের মধ্যে প্রজনন ।
- হাফ সিব : সৎ ভাই বোনের মধ্যে প্রজনন ।

ইনব্রিডিং এর কুফল :

আন্ত প্রজননের ক্ষতিকারক প্রভাব প্রায় সকল খামারজাত প্রাণীর মধ্যে পরিলক্ষিত হয় যাহার বহি:প্রকাশ হচ্ছে।

১। দৈহিক বৃদ্ধির উপর প্রভাব : আন্ত প্রজননের ফলে খামার জাত প্রাণীর দৈহিক বৃদ্ধির উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে এবং দৈহিক বৃদ্ধি হ্রাস পায় ।

২। পুনরুৎপাদন দক্ষতার উপর প্রভাব : আন্ত প্রজননের ফলে পুনরুৎপাদন দক্ষতা হ্রাস পায় । শুক্রাশয়ের বৃদ্ধি ধীরে ধীরে ঘটে এবং স্ত্রী ও পুরষ উভয়েরই পূর্ণতা প্রাপ্তি দেরীতে ঘটে । ওভুলেশনের হার হ্রাস পায় এবং ভ্রূনের মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায় ।

৩। আন্ত: প্রজননের ফলে প্রাণীর সজীবতা হ্রাস পায়। সাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় এবং মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায় ।

৪। দুগ্ধ উৎপাদনকারী গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের চর্বির পরিমান হ্রাস পায় ।

৫। আন্ত: প্রজননের ফলে প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিকলঙ্গতা দেখা দেয় ।

গাভীর গরম হওয়া লক্ষণ ও প্রজননের উপযুক্ত সময়

গাভী সাধারণত ২১ দিন পর পর গরম হয়। গরম অবস্থায় অস্থির ভাব, হাম্বা হাম্বা ডাকা ও অন্য গাভীর উপর লাফিয়ে ওঠা বা অন্য গাভীকে নিজের উপর উঠতে দেওয়া। ঘনঘন অল্প পরিমান প্রসাব হওয়া, খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া । দুধাল গাভীর ক্ষেত্রে হঠাৎ দুধ কমে যাওয়া । অন্য গাভীর যৌনাঙ্গ শুকতে থাকা, কোমর নিচু রাখা ও লেজের গোড়ার সংযোগ স্থল উচু হয়। কান খাড়া রাখা, যোনীমুখ ফুলে যাওয়া, হালকা লালচে হওয়া ও যোনীপথ দিয়ে জেলির মত স্বচ্ছ লালা ঝরতে থাকা, সার্ভিক্সের মুখ খোলা থাকা । সাধারণতঃ ৬০% গাভী ২৪ ঘন্টা, ৪০% গাভী ১৬-৩০ ঘন্টা কাল গরম থাকে। লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ১২-১৮ ঘন্টার মধ্যে প্রজনন করলে/ পাল দিলে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। গাভী গরম হওয়ার শুরু থেকে ৬ ঘন্টার মধ্যে পাল দিলে ৪৫-৭০% গর্ভবতী হয়, গরম হওয়ার ৭-১৮ ঘন্টার মধ্যে পালদিলে ৭০-৯০% গর্ভবতী হয়। ১৮ ঘন্টার পরে পাল দিলে সফলতার হার কমতে থাকে। তাই কোন গাভী সকালে গরম হলে সন্ধায়, আর সন্ধায় গরম হলে সকালে প্রজনন করাতে হবে।

দুগ্ধজাত গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা প্রসুতি গাভীর ঘরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রসুতিগাভীর ঘর/বাছুরেরঘরের বৈশিষ্ট্য বাসস্থানেরজন্য স্থানীয়উপকরণ এর ব্যবহার

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের দেশে গাভী পালনের ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফলন না পাওয়ার যে কয়টি কারণ আছে তার মধ্যে অনুন্নত বাসস্থান ব্যবস্থাপনা উল্লেখযোগ্য। সঠিক বাসস্থান ব্যবস্থাপনার অভাবে উৎপাদন অনেক কমে যাচ্ছে এবং কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বলে দিনে দিনে গরু পালনে কৃষকদের অনীহা তৈরি হচ্ছে। এই জন্য গরু বাসস্থান ব্যবস্থাপনা সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

- দুগ্ধজাত গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।
- গাভীর সঠিক বাসস্থান তৈরির বিষয়ে আগ্রহী করে তোলা।
- বাসস্থান তৈরির বিষয়ে কোন কোন বিষয়সমূহ গুরুত্বপূর্ণ তা জানা।
- বাসস্থান তৈরির প্রয়োজনীয় উপকরণ সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- বাসস্থান এর পরিমাপ সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ করা

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ : ম্যানিলা পেপার, মার্কার, একটি আদর্শ গরু ঘর।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপকরনের ব্যবহার।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গরুর বাসস্থান নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের বাসস্থান ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- ডেয়রী ফার্ম নির্মাণ পরিকল্পনার কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন ?
- ঘর কেন প্রয়োজন ?
- আমাদের দেশের জন্য উপযোগী প্রধানত কয় ধরনের গবাদিপ্রাণির গৃহ নির্মান করা যায় ?
- আপনারা দুগ্ধজাত গরুর কেমন ঘরে রাখেন?
- উদাম ঘর পদ্ধতির সুবিধাসমূহ ও অসুবিধাসমূহ কি কি ?
- প্রাপ্তবয়স্ক একটি গরু রাখার জন্য কতটুকু জায়গা দিতে হবে?
- প্রধানত বাঁধা গোশালা কয় ধরনের হয় ?
- এক সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা সুবিধাসমূহ ও অসুবিধাসমূহ কি কি ?
- ডেয়রি ফার্মের বিভিন্ন স্থান ও ঘরের নাম কি কি ?

- একটি আদর্শ গোয়াল ঘর কেমন হওয়া উচিৎ?
- কিভাবে আমরা বর্তমান ঘরকে আদর্শ ঘরে রূপান্তরিত করতে পারি?
- উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন।
- ম্যানিলা পেপারে একটি আদর্শ গরুর ঘরের নকশা উপস্থাপন করে গরুর ঘরের আকার, আলো বাতাস চলাচলের
- বিষয়সমূহ এবং ঘরের মাপ অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝিয়ে দিন। কিভাবে কৃষকদের বর্তমানের গরুর ঘরে আলো বাতাস চলাচল এবং প্রয়োজনীয় আয়তন ঠিক রাখা যায় তা বুঝিয়ে দিন। অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে বাস্তবে একটি ঘর পরিদর্শন করুন। ঘরটিতে কি কি সুবিধা ও কি কি অসুবিধা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করুন এবং সে আলোকে একটি আদর্শ গরুর ঘর তৈরির সহজ কৌশল বুঝিয়ে দিন। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করুন এবং ঘর তৈরীতে এবং ঘর ব্যবস্থপনা করতে উদ্ভুদ্ধকরুন ।

কারিগরি নোট

ডেয়রী ফার্ম নির্মাণ পরিকল্পনার নিম্নোক্ত কতিপয় বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন ।

- প্রাণির সংখ্যা, বয়স ও প্রকৃতি অনুয়ায়ী ফার্ম নির্মান করা উচিত।
- প্রাণির জন্য আরামদায়ক ও স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- ফার্ম পরিকল্পনার জন্য বিভিন্ন কাজ অল্প সময়ে সুষ্ঠভাবে সম্পর্ণ করার সুবিধা।
- পানি ও বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।
- প্রয়াজনবোধে ফার্ম সম্পসারণের ব্যবস্থা রাখা।
- ব্যববহুল পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা গ্রহন করা উচিত নয়।
- নির্মান অবশ্যই মজবুত ও টেকসই হতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও রুচিসম্মত পরিবেশের ব্যবস্থা।
- খামরের সন্নিকটে ঘাস উৎপাদনের জমি থাকা।
- গোবর ও অন্যান্য আবর্জনা নিস্কাশানের ব্যবস্থা থাকা।

গবাদিপ্রাণির বাস গৃহের শ্রেণি বিভাগ

গবাদিপ্রাণির বাসগৃহ প্রধানত আবহাওয়া, ভৌগলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অবস্থার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে বা দেশের গবাদিপ্রাণির বাসগৃহ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। সে কারনে সব অঞ্চল বা সবদেশেরই উপযোগী এমন কোন গবাদিপ্রাণির আদর্শ বাসগৃহ তৈরির নকশা নাই আমাদের দেশের জন্য উপযোগী প্রধানত দু' ধরনের গবাদিপ্রাণির গৃহ নির্মান করা যায়। যথা

(১) উদাম ঘর পদ্ধতি এবং

(২) বাধা ঘর পদ্ধতি

(১) উদাম ঘর পদ্ধতি

এপদ্ধতিতে বাচ্চা প্রসব ও দুধ দোহার সময় ছাড়া দিন ও রাত্রি গবাদিপ্রাণিরকে দেয়াল বেষ্টিত খোলা জায়গায় পালন করা হয়। তবে প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন ঝড়, বৃষ্টি, গরম, ঠান্ডা ইত্যাদি সময় প্রাণির নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য খোলা স্থানের সংলগ্ন ঘর সংযুক্ত থাকে এ ধরনের বাসগৃহে একটি খাদ্য পাত্র ও পানি পাত্র সকল গবাদিপ্রাণির জন্য উন্মুক্ত থাকে ।

বয়স্ক বাছুর ও দুধ দিচ্ছেনা এমন গাভীর জন্য উদাম ঘর পদ্ধতি সুবিধাজনক। এই পদ্ধতির ঘরে প্রায় সব প্রজাতির প্রাণিকে পালন করা যায়। এইরূপ গবাদিপ্রাণির বাসগৃহ বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে ব্যবহার উপয়োগী। তবে অধিক বৃষ্টিপাত এবং গরম অঞ্চরের জন্য উদাম ঘর পদ্ধতির নকশা কিছুটা হেরফের করার প্রয়োজন পড়ে।

গবাদিপ্রাণির ঘরের প্রয়োজনীয় মাপ

উদাম ঘর পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জায়গার মাপ টেবিলে নিম্নে দেয়া হল।

টেবিল :- উদাম ঘর পদ্ধতিতে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির প্রয়োজনীয় জায়াগা।

গবাদিপ্রাণি	বর্গমিটার/ গবাদিপ্রাণি		গবাদিপ্রাণির সংখ্যা/ঘর (PEN)	গবাদিপ্রাণি	বর্গমিটার/ গবাদিপ্রাণি		গবাদিপ্রাণির সংখ্যা (PEN)
ষাঁড় (গরু, মহিষ)	আবৃত স্থান	খোলা স্থান		গাভী (গরু)	আবৃত স্থান	খোলা স্থান	
গাভী (মহিষ)	১২.০	১২০.০	০১	প্রসূতি গাভী	০৩.৫	০৭.০	৫০
বাছুর (≤৩ মাস)	০৪.১.	০০৮.০	৫০	বকন (গর্ভধারণ পযন্ত)	১২.০	১২.০	০১

উদাম ঘর পদ্ধতির নকশা

প্রথমে অল্প সংখ্যক গাভী নিয়ে ছোট আকারে ফার্ম আরম্ভ করা উচিত। ছোট ডেয়রি ফার্ম থেকে যখন আর্থিক লাভ হবে এবং ফার্মের ব্যবস্থাপনা সমন্বন্ধে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা হবে তখন ফার্মে গবাদিপ্রাণির সংখ্যা বৃদ্ধি করা ভালো। ডেয়রি খামারে লাভজনক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে টেকসই ও মূল্যবান জিনিসপত্র দিয়ে স্থায়ীভাবে ডেয়রি ফার্ম তৈরি করা যেতে পারে। প্রাণিরর সংখ্যার অনুপাতে জমির প্রয়োজন হয়।

উদাম ঘর পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- উদাম ঘর নির্মান খরচ কম এবং সহজেই সম্প্রসারিত করা যায়।
- গবাদিপ্রাণির স্বচ্ছন্দে ঘোরা ফেরা করতে পারে ফলে ব্যায়ামের কাজ হয়।
- ওলান ও পায়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা কম থাকে।
- জরুরী অবস্থায় পরিকল্পিত সংখ্যার ১০-১২ গুন গবাদিপ্রাণিকে রাখা যায়।
- গরম হওয়া গবাদিপ্রাণিকে সহজেই সনাক্ত করা যায়।
- একই খাদ্য ও পানীয় সকল গবাদিপ্রাণির জন্য সমভাবে উন্মুক্ত থাকে।
- গাভী বাঁধা ঘর পদ্ধতি অপেক্ষা ৫-১০% দুধ বেশি দেয়।

উদাম ঘর পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ

- গবাদিপ্রাণির মারামারি করার সম্ভাবনা বেশি থাকে।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল গবাদিপ্রাণি সবলটির সাথে প্রতিযোগীতায় খেতে পারেনা ফলে দূর্বল গবাদিপ্রাণি আরোও দুর্বল হয়।
- গাভীর দুধ দোহানের জন্য পৃথক দুধ দোহানের ঘরের প্রয়োজন হয়।

(২) বাঁধা ঘর পদ্ধতি

এই পদ্ধতির গোশালাকে প্রচলিত গোশালা (ঈড়হাবহঃরড়হধষ ইধৎহ) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে গরুর গলায় দড়ি বা লোহার জিঞ্জির দিয়ে সীমাবদ্ধস্থানে বেঁধে পালন করা হয়। একই স্থানে গাভীর দুধ দোহন ও খাওয়ানো সম্পূর্ণ করা হয়। বাঁধা ঘর পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধা সমূহ নিম্নে দেয়া হ'ল।

সুবিধাসমূহ (ক) প্রতিকূল আবহাওয়ায় গবাদিপ্রাণি নিরাপদে থাকে (খ) গবাদিপ্রাণির বিছানার জন্য ব্যয় কম হয় । (গ) গাভীর বাঁধা স্থানে দুধ দোহন সহজ হয়। (ঘ) কৃত্রিম প্রজননের জণ্য বেশ সুবিধাজনক । (ঙ) দীর্ঘ ও শীত প্রধান দেশে বা অঞ্চলে এ পদ্ধতি বেশ উপযোগী।

অসুবিধাসমূহ (ক) তূলনামূলক ভাবে নির্মান খরচ উদাদম ঘর অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুন। (খ) সংরক্ষণ খরচ বেশি। (গ) গবাদিপ্রাণির স্বেচ্ছায় ঘোরাফেরা করার কোন ব্যবস্থা থাকে না। (ঘ) বর্ষাকালে গোশালার বায়ূ আর্দ্র ও স্যাঁতসেতে হয়ে যায়।

বাঁধা ঘর পদ্ধতির নকশা

বাধা ঘর পদ্ধতির গোশালার গবাদিপ্রাণি সব সময় বাঁধা অবস্থায় রাখা হয়। সেজন্য গোশালা সহজে যাতে পরিস্কার করা যায় এবং গরু যাতে আরামে তাকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গোশালা নির্মান করা প্রয়োজন। প্রধানত বাঁধা গোশালা দু ধরনের হয় যথা- (ক) এক সারি বিশিষ্ট গোশালা এবং (খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা।

(ক) এক সারি বিশিষ্ট গোশালা

সাধারণত অল্পসংখ্যক গবাদি গবাদিপ্রাণির জন্য গ্রাম অঞ্চলের গৃহস্থের বাড়িতে একটি লম্বা সারিতে গরু বেঁধে পালনের জন্য এ ধরনের গোশালা তৈরি করা হয়। এ ধরনের গোশালার পালনের জন্য গরুর প্রয়োজনীয় জায়াগার পরিমান টেবিরে দেয়া হলো। গবাদিপ্রাণির সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জায়গা নির্ধারণ করে গোশালা তৈরি করতে হয়। প্রতিটি গবাদিপ্রাণিকে পৃথক রাখার জন্য লোহার তৈরি জি আই পাইপ দিয়ে পার্টিশন দেয়া ভাল। সাধারণত পার্টিশনেরপাইপ লম্বায় ৯০ সেঃ মিঃ (৩ ফুট) ও উচ্চতায় ৪৫ সেঃ (৯-১.৫ ফুট) হওয়া প্রয়োজন। গোশালা হবে এক চালা বিশিষ্ট ঘর । এক চালা ঘরের ছাদ প্রায় ৩০০ সেঃ মিঃ। (১০ ফুট) উঁচু করতে হয়।

(খ) দ্বিসারি বিশিষ্ট গোশালা

অধিক সংখ্যক গবাদিপ্রাণি পালনের জন্য দ্বি-সারি বিশিষ্ট গোশালা প্রয়োজন হয়। এই ধরনের গোশালায় গবাদিপ্রাণিকে দু'ভাবে দু'সারিতে রাখা হয় যথা- (অ) মুখোমুখি পদ্ধতি এবং (আ) লেজের দিকে সোজা বা পিছো পিছি পদ্ধতি।

টেবিল-: এক সারি বিশিষ্ট গোশালায় প্রতিটি পশুর জন্য প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণ

গবাদিপ্রাণি	দাঁড়াবার স্থান (সেঃ মিঃ)	পাশের জায়গা (সেঃ মিঃ)	খাবার পাত্র(সেঃ মিঃ)	নালা (সেঃ মিঃ)
গরু	১৬৫	১০৫	৭৫	৩০
মহিষ	১৮০	১২০	৭৫	৩০

মুখোমুখি পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে গোশালায় দুই সারি গবাদিপ্রাণি সামনা সামনি থকে। আর দু'সারি খাবারের চাড়ি বা খাবার পাত্রের মাঝখানে ৪ ফুট বা ১২০ সেঃ মিঃ চওড়া রাস্তা থাকে যা খাবারের পাত্রে খাবার দেবার জন্য ব্যবহার করা হয়। দাঁড়াবার স্থান গরুর জন্য ৫.৫ফুট মহিষের জন্য ৬ ফুট। পাশের জায়গা গরুর জন্য ৩.৫ ফুট ও মহিষের জন্য ৪.০ ফুট প্রয়োজন হয়।

মুখোমুখি পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

(ক) দেখাতে ভাল লাগে। (ক) গবাদিপ্রাণি নিজ জায়গায় স্বচ্ছন্দ বোধ করে। (গ) সূর্যালোক নালায় পড়ায় রোগ জীবানু ধ্বংস হয়। (ঘ) একসাথে দুই সারি গবাদিপ্রাণিকে খাবার সরবরাহ সুবিধাজনক । (ঙ) দুধ দোহনের সময় অধিকতর আলো পাওয়া যায়। (চ) অপ্রশস্থ জায়াগায় এ ধরনের গোশালা সুবিধাজনক।

(আ) লেজের দিকে লেজ বা পিছোপিছি পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে উভয় সারির মাথা বর্হিমূখী থাকে। এ ধরনের গোশালায় দু'সারি গরু দাঁড়াবার জায়গার জন্য ৬.০ ফুট জায়গার প্রয়োজন হয়।

পিছোপিছি পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

- গোশালা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সময় কম লাগে।
- গোবর ও আবর্জনা পরিস্কার, গবাদিপ্রাণির শরীর পরিস্কার ও দুধ দোহনের জন্য মাঝখানের সাধারণ পথটি বেশ উপযোগী।
- এক গরুর শ্বাস প্রশ্বাস অন্য গুরুর দেহে লাগানো ও গরু বাহিরের দিকে থেকে বিশুদ্ধ বাতাস গ্রহন করতে পারে যা স্বাস্থ্য সম্মত।
- এই পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণির পশ্চাদভাগ সহজে দৃষ্টি গোচর হয়। তাই গাভীর পশ্চাদভাগে রোগ, ক্ষত বা পরিবর্তন সহজেই চোখে পড়ে।
- ঘরের দেয়াল পরিস্কার থাকে এবং এক প্রাণি থেকে অন্য প্রাণিতে রোগ জীবানু ছাড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ডেয়রি ফার্মের বিভিন্ন স্থান ও ঘরের বিবরণ

একটি পূনাঙ্গ ডেয়রি ফার্মে যেসব প্রয়োজনীয় স্থান ও ঘর থাকে তার বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো।

(১) দুধ দোহন শালা

উদাম ঘর পদ্ধতিতে পালিত গাভীর দুধ দোহনের জন্য পৃথক দুধ দোহন শালা প্রয়োজন হয়। আমাদের মত দেশে দুধ দোহন কাজের জন্য স্বল্প খরচে দুধ দোহক পাওয়া যায়। সুতারং হস্ত দ্বারা দুধ দোহন কাজ অধিক লাভজনক । তবে বড় আকারের ডেয়রি ফার্মে দোহন যন্ত্রের মাধ্যমে দুধ দোহন উত্তম।

(২) দুগ্ধ ঘর

ফার্মে বিভিন্ন গাভীর দুধ দোহন শেষে যে ঘরে দুধ জমা, ওজন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয় সে ঘরকে দুগ্ধ ঘর বলে। ফার্মের মধ্যে এমন জায়গায় এই ঘরটি এমনভাবে তৈরি করা উচিৎ যেন দূলোবালি, মশামাছি ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। এরুপ দুগ্ধ ঘরের আকার আয়তন ফার্মে কি পরিমান দুধ উৎপাদন হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল। দুগ্ধঘরের মেঝেতে দুধের যন্ত্রপাতি, দুধ ঠান্ডা রাখার ক্যান, ক্যান র‍্যাক, দুধ দোহন পাত্রের র‍্যাক, বেসিন, ধৌত করার সরঞ্জাম ও দুধ রেকর্ডের যন্তপারিত রাখার ব্যবস্থা থাকে। তবে বড় আকারের ডেয়রি ফার্মে দুধের ঘরে বিভিন্ন পৃথক পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকে। যেমন দুধ রেকর্ড কাম ঠান্ডা ঘর, দুধের বাসনপত্র ও যন্ত্রপাতির ঘর এবং বাসনপত্র ধোয়ারঘর ইত্যাদি।

(৩) প্রসূতি ঘর

গাভীর বাচ্চা প্রসবের ২-৩ সপ্তাহ পূর্ব থেকে বাচ্চা প্রসবের জণ্য যে ঘরে গর্ভবতী গাভীকে রাখা হয় সে ঘরকে প্রসূতি ঘর বা প্রসব শালা বলা হয়। আসন্ন প্রসাবা গাভী অন্যান্য গরুর সাতে রাখলে নানারূপ বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা থাকে। আবার সাধারণ ঘরে প্রসব করলে পরিবেশ নোংরা হয়। সাধারণ ফার্মের প্রজননক্ষম গাভীর মোট সংখ্যার শতকরা ৫ভাগ প্রসূতি ঘর থাকা আবশ্যক। প্রসূতি ঘরের ৩ ৪ মিটার অংশ আবৃত এবং ৩.৪ মিটার অংশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা খোলা জায়গা থাকে। আবৃত ঘরের ১.২৫ মিটার উঁচু দেয়াল দ্বারা বেষ্টিত এবং খোলা অংশের দিকে ১.২ মিটার চওড়া খোলা দরজা রাখা হয়। প্রতিটি প্রসূতি ঘরে একটি করে খাবার ও পানির পত্র থাকে। প্রসূতি ঘরের মেঝে পাকা হওয়া প্রয়োজন। ঘরের মেঝেতে খড় বিচালী বিছিয়ে দিতে হয়ে।

(৪) বাছুরের ঘর

সাধারণত দুধ দোহন ঘরের পার্শ্বে প্রান্তে বাছুরের ঘর থাকা প্রয়োজন। এতে বাছুর দিয়ে দুধ দোহন, বাছুরকে দুধ খায়ানো ও যত্ন নেয়া সহজ হয়। বড় ডেয়রি খামারে বাছুরের সংখ্যা বেশি হলে বাছুরের বয়স অনুযায়ী পৃথক গর থাকা ভাল ।

(৫) দুগ্ধবতী/শুল্ক গাভীর ঘর

ডেয়রি ফার্মে দুগ্ধবতী গাভী ও শুল্ক যা দুধ দিচ্ছেনা এমন গাভীর পৃথক ঘর রাখা প্রয়োজন। তবে ছোট ফার্মে ভয় গাভীকে একসাথে পালন করা যায়। উদাম ঘর পদ্ধতিতে পৃথক ঘর এবং বাঁধা ঘর পদ্ধতিতে পৃথক সারিতে পালন করা উত্তম।

(৬) বকনের ঘর

বকনের ছায় মাস বয়স থেকে প্রজননক্ষম হওয়া পর্যন্ত পৃথক ঘরে পালন করা ভালো। তবে এঁড়ে বাছুরের বয়স ছয় মাস হলে ডেয়রি ফার্মে পালন করাই উত্তম। বকনের শেড শুল্ক গাভীর শেডের পার্শ্বে হওয়া ভালো।

দুধের পরিমান (লিটার)	মেঝের মাপ মিটার	দুধের পরিমাণ (লিটার	মেঝের মাপ (মিটার)	৭০০ লিটার দুধের অতিরিক্ত প্রতি ৪০০ লিটারের জন্য অতিরিক্ত ০.৩৭ বর্গমিটার জাগয়া প্রয়োজন
<১০০	৩.৭X৩.০	২০০-৪৫০	৩.৭X৪.৪	
১০০-২০০	৩.৭X৩.৭	৪৫০-৭০০	৩.৭X৫.১	

(৭) ষাঁড়ের ঘর

ডেয়রি ফার্মের এক প্রান্তে ষাঁড়ের সেড থাকে। প্রতিটি ষাঁড়ের জন্য পৃথক ঘর থাকা উচিত। সাধারণত ফার্মে স্বাভাবিক প্রজননের জন্য ৫০ টি প্রজননক্ষম বকন ও গাভীর জন্য একটি ষাঁড়ের প্রয়োজন হয়। তবে কৃত্রিম প্রজননের সুবিধা থাকলে ফার্মে ষাঁড় রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ষাঁড়ের সেডের আবৃত অংশ ৩-৪ মিটার এবং খোলা অংশ ১২০ বর্গমিটার।

(৮) অসুস্থ গবাদিপ্রাণির শেড

অসুস্থ প্রাণির ঘর ফার্মের অন্যান্য ঘর থেকে বেশ কিছু দূরে করা দরকার। কারন কোন পশুর সংক্রামন রোগে আক্রান্ত হলে পাশের সুস্থ গবাদিপ্রাণির বা পার্শ্ববর্তী ঘরের সুস্থ গবাদিপ্রাণিতে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটতে পারে তাই অসুস্থ গবাদিপ্রাণির পৃথক ঘর তৈরি ও পালনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ করা যায়। সাধারণত ১৫-২০ ফুট মাপের একটি ঘর তৈরি করলে ফার্মের অসুস্থ গবাদিপ্রাণিক পৃথকভাবে যত্ন করা যায়।

ডেয়রি ফার্মের বিভিন্ন নির্মাণমূলক গঠন

ডেয়রি ফার্মের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে দেয়াল ও ছাদ এবং পরে ভিতরের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে হয়। ফার্মের বিভিন্ন অংশ তৈরি করতে বিভিন্ন জিনিস পত্রের প্রয়োজন হয়। তবে ফার্মের ধরন, দ্রব্যের মূল্য ও জিনিসপত্রের সহজলভ্যতার উপর ভিত্তি করে ডেয়রি ফার্ম নির্মান করতে হয়।

(ক) গোশালার মেঝে নির্মান

গোশালার মেঝে কাঁচা বা পাকা হতে পারে। তবে পাকা মেঝে যেন মসুণ না হয়। কারণ তাতে গবাদিপ্রাণির পিছলে পড়ার আশংকা থাকে। তাই সিমেন্ট, পাথর বালি দিয়ে ঢালাই করে মেঝে তৈরি করে দড়ি বসিয়ে মাঝে মাঝে দাগ কেটে দিতে হয়। মেঝের নর্দমার দিক অল্প ঢালু করে তৈরি করতে হবে। এতে গোবর তোলার পর পানি দিয়ে ধুয়ে দিলে শুকিয়ে যেতে দেরি হয় না।

(খ) দেয়াল

গোশালার দেয়াল মাটি বা ইট দিয়ে তৈরি করা যায়। তবে পাকা দেয়াল অনেক ভালো। পাকা দেয়ালের ভিতর দিক সিমেন্ট দিয়ে উত্তমরূপে প্লাস্টার করা উচিত। এতে গবাদিপ্রাণিকে আক্রান্তকারী কীট পতঙ্গ দেয়ারে ফাঁকফোকর না পেয়ে বাসা বাঁধতে পারে না। গোশালার দেয়াল প্রায় ১০ ফুট উচ্চ হয় এবং দেয়ালে প্রায় ৪ ৩ ফুট জানালা থাকে।

(গ) ছাদ

গোশালার ছাদ খড়, টালি, অ্যাসবেসটর ইত্যাদি দিয়ে তৈরি করা যায়। অবশ্য পাকা ছাদ হলে সব দিক থেকে উত্তম।

(ঘ) নর্দমা

গবাদিপ্রাণির মলমূত্র ও গোশালা পরিস্কার করে পানি বের করার জন্য পাকা নালা বা নর্দমা প্রয়োজন। এই নালার ঢালু দিকের শেষ প্রান্তে পানি বা মূত্র সংগ্রহের জন্য একটি চৌবাচ্চা ও গর্তের প্রয়োজন। চৌবাচ্চার জমাকৃত মূত্র ও পানি জমির সাব হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া গোশালার ধারে কাছে গোবর সার সংগ্রহের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

(ঙ) ভোজন পাত্র

গবাদিপ্রাণির ভোজন পাত্র সিমেন্ট দিয়ে কংক্রিটের হওয়া প্রয়োজন। এই রূপ ভোজনপাত্র মজবুত ও টেকসই এবং সহজে পরিস্কার করাও যায়। ভোজনপাত্র হবে লম্বা আকৃতির । আর প্রতিটি গবাদিপ্রাণি জন্য একটি নিদিষ্ট আয়তনের ভোজন পাত্রের প্রয়োজন হয়। লম্বা ভোজন পাত্রের উপর একটি পাইপ লম্বালম্বি ভাবে দেয়া হয় যাতে গবাদিপ্রাণির ভোজন পাত্রে প্রবেশ করতে বা পড়ে যেতে না পারে।

(চ) পানি পানের পাত্র

গবাদিপ্রাণির পানির পাত্র ইট, সিমেন্ট ও বালি দিয়ে গোলাকৃতির বানাতে হয়। বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপ্রাণির পানির পাত্রের আকার ও মাপ দেয়া হয়েছে। পানি পাত্রের চারপাশ পরিস্কার ও শুল্ক রাখার জন্য দু মিটার চওড়া একটি প্লাটফর্ম তৈরি করতে হয়।

(ছ) ফার্মের দরজা ও পথ

ডেয়রি ফার্মে দু ধরনের গেট হয়। যেমন প্রত্যেকটি গোশালা রজন্য পৃথক পৃথক গেট এবং ফার্মের প্রধান গেট। ট্রাক, গাড়ি ইত্যাদি যানবাহন সহজেই যাতায়াতের জন্য ফার্মের প্রধান গেট বেশ চওড়া হওয়া প্রয়োজন। প্রতিটি গোশালার দরজা প্রায় ১.২ মিটার চওড়া এবং প্রধান গেট ২.৫ মিটার চওড়া হওয়াপ বাঞ্ছনীয়। ফার্মের গেট লোহার বা শক্ত কাঠ দিয়ে দু'ভাগে তৈরি করা যায় যথা- (অ) জোড়া কবজা গেট ফার্মের জন্য বেশ উপযোগী এবং (আ) জোড়া বার গেট গরু গোড়া, মহিষ ইত্যাদি বড় গবাদিপ্রাণির ফার্মের জন্য উপযোগী।

(জ) ফুট বাথ

ফার্মের গেটের সামনে ১২ ৪ মিটার আয়তন এবং ০.৩ মিটার গভীরাত বিশিষ্ট ফুট বাথ ট্যাক্স তৈরি করতে হয়। এই ট্যাঙ্ক জীবানুনাশক সলুশন দিয়ে পূর্ণ রা খতে হবে। ফার্মের ভিতর প্রবেশ ও ভিতর থেকে বাইরে আসা গবাদিপ্রাণির পা গাড়ীর চাকা জীবাণু মুক্ত করা ফুট বাথের উদ্দেশ্য এতে ফার্মে বাইরের জীবানু সংক্রমন ঘটাবেন।

ক্রঃ নং	প্রতিটি গবাদিপ্রাণির জন্য প্রয়োজন সেন্টিমিটার)				
	ভোজন পাত্র	পানি পাত্র	চওড়া	গভীরতা	দেওয়ালের উচ্চতা
১। গরু ও মহিষ	৬০-৭৫	৬.০-৭.৫	৬০	৪০	৫০
২। বাছুর	৪০-৫০	৪.০-৫.০	৪০	১৫	২০

গর্ভবতী গাভী, নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর বিশেষ যত্ন

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গরু পালন করতে হলে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে যেমন; গর্ভবতী, দুগ্ধবতী, বাচ্চা পালন বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। বাচ্চা প্রসবের সময় হতে গরু বাচ্চাকে শাল দুধ খাওয়ানো তথা দুধ দেওয়া সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামীন পরিবেশে এই সময় গাভীর পরবর্তী বাচ্চা ধারনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং সদ্যপ্রসুত বাচ্চার দেখভাল কাজও করে থাকে। তাই গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী গাভী যত্ন সেশনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহন কারীগণ গর্ভবতী গাভী, প্রসব বরবর্তী নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন এবং বাছুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।নিজ হাতে বাছুরকে শাল দুধ খাওয়ানোর কৌশল শিখতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, গর্ভবতী গাভী ও দুগ্ধবতী গাভী

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রশ্নোত্তর ।

সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন এবং অংশগহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গর্ভবতী গাভী, নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর বিশেষ যত্ন গুরুত্ব আলোচনা করবেন।
সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গর্ভবতী গাভী, নবজাত বাছুর ও দুগ্ধবতী গাভীর বিশেষ যত্ন নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- গর্ভবতী গাভীর যত্ন বলতে কি বুঝায় ?
- গাভী সাধারনত কতদিন পর পর ডাকে আসে?
- ডাকে আসার কত সময় পর প্রজননের জন্য নিতে হয়?
- গাভী গর্ভকালীন সময় কতদিন?
- গর্ভবতী অবস্থায় গাভী বিশেষ কোন যত্ন নিতে হয় কিনা?
- প্রসবের সময় ও পর মায়ের কি যত্ন নিতে হয়?
- দুধ দেয় যে গাভী তাদের আলাদা কোন যত্নের দরকার আছে কিনা?
- কেন বিশেষ যত্ন নিতে হয় ?
- প্রসবের সময় গাভিকে কোথায় রাখতে হয়?
- গর্ভফুল সাধারণত কত সময়ের মাঝে পড়ে যায়?
- বাচ্চা প্রসবের পর গাভিকে কোন প্রকার খাবার দেওয়া হয় কিনা?
- কখন ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে?

অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে গর্ভবতী গাভী ও গর্ভধারন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। তারা এই ধরণের গাভী যত্নের ক্ষেত্রে কী করেন তা প্রশ্ন করে জেনে সঠিক ব্যবস্থাপনা কৌশলটি জানিয়ে দিন।

প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নমুনা প্রদর্শন করুন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নিন এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।

কারিগরি নোট

গর্ভবতী গাভীর যত্ন সমূহ নিম্নরূপ

- গাভীর গর্ভধারন কালের হিসাব ও সম্ভাব্য বাচা প্রসবের তারিখ জানা থাকতে হবে।
- গর্ভকালের সাতমাস পর্যন্ত গাভীর খাদ্য পরিচর্যা দুধ দোহন, স্বাভাবিক ভাবেই চলবে। তবে, ৭ মাসের পরেই গাভীকে অবশ্যই পৃথক করতে হবে। এই সময় খাদ্য পরিচর্যা ও বাসস্থান গাভীর অবস্থার উপযোগী হতে হবে।
- ঘরের মেঝে যদি পেছন দিকে ঢালু থাকে তবে তা সমতল করে দিতে হবে।
- পর্যাপ্ত আলো, বাতাস সুপরিসর; সহজেই গাভী নড়াচড়া করতে পারে এরকম ঘরে রাখতে হবে।
- গাভীর ঘর দৈনিক পরিস্কার পরিছন্ন করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে জীবানুনাশক ওষুধ মিশ্রিত পানি দ্বারা ঘর ধুয়ে দিতে হবে।
- গাভী যেন পড়ে গিয়ে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গর্ভবতী গাভীর উপর অন্য কোন গরবা প্রাণী যেন লাফিয়ে না উঠতে পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- গর্ভাবস্থায় (৭-৮) মাসেই দুধ দোহন বন্ধ করতে হবে। দুধের প্রবাহ বন্ধ না হলে দানা খাদ্য কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে;
- গাভীর শোবার জায়গাতে খড় দিয়ে বিছানা তৈরী করে দিতে হবে। বিছানার খড় দৈনিক রোদে শুকাতে হবে।
- গাভীকে কোনক্রমেই ভয় পাওয়ানো, দ্রুত তাড়ানো বা উত্তেজিত করা যাবে না।
- গর্ভবতী গাভী দ্বারা হালটানা, ভারবহন ফসল মাড়াই ইত্যাদি কাজ করানো যাবে না।
- গরমের দিনে গাভীকে প্রতিদিন গোসল করাতে হবে।
- আসন্ন প্রসবা গাভীকে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হবে। প্রসবের ২/৩ দিন আগে থেকে ২৪ ঘন্টা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

আমরা যদি উপরের বিষয়গুলি মেনে চলি তাহলে গাভী নিরাপদে প্রসব করবে।

প্রসবের পূর্বাভাস

- প্রসাবের দ্বার ফুলে যাবে বা প্রসারিত হবে।
- ঘন ঘন ওঠা-বসা করবে।
- লেজের দুই-সাইডে বা গোড়ার মাংসটা বসে যাবে।
- সাদা স্রাব বের হবে।
- পেট ব্যথার জন্য গাভী সর্বদা ছটফট করবে।
- পানি ভাংবে।

উপরের লক্ষণগুলো বুঝে গাভীর প্রসবের জন্য নিম্নোক্তভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রসবকালীন সময়ে করণীয় বিষয়সমূহ

- প্রথমে পা এবং মাথা এক সাথে বের হবে যদি এর একটা অঙ্গ যদি না আসে তাহলে এটাতে কোনভাবেই হাত দেওয়া যাবে না।
- যদি তিনটা অঙ্গ একসঙ্গে আসে তাহলে হাতটা জীবানু মুক্ত করতে হবে।
- এক্ষেত্রে, খুব সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন

দুগ্ধবতী গাভীর উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যা না হলে দুধ উৎপাদন কমে যায় ও নানান রোগ ব্যাধির আক্রমনও ঘটতে পারে। তাই দুগ্ধবতী গাভীর সর্বোচ দুধ উৎপাদন, উর্বরতা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নোক্ত যত্ন ও পরিচর্যা প্রয়োজন।

- দুগ্ধবতী গাভীকে খাদ্য খাওয়ানো, শরীর পরিস্কার, দুধ দোহন, ব্যায়াম প্রভৃতি কাজ নিয়মিত যথাসময়ে করতে হয়।
- প্রত্যহ কমপক্ষে দু'বার গোশালার মেঝে পরিস্কার করতে হবে।
- গোশালার দেয়াল, মেঝে, নালা নর্দমা জীবানুণাশক (ডেটল বা ফিনাইল) মিশ্রিত পানি দিয়ে প্রত্যহ পরিস্কার করতে হবে।
- গাভীকে পরিস্কার পরিছন্ন রাখা প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে প্রতিদিন ও শীতকালে সপ্তাহে দু'বার গোছল করিয়ে কাপড় দিয়ে মুছে ফেলা উত্তম।
- গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমান খাদ্য খাওয়ানোর উপর নির্ভর করে। গাভীর দৈহিক ওজন, উৎপন্ন দুধের পরিমান, দুধে চর্বির মাত্রা, গর্ভাবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে খাদ্য তালিকা পরিমানসহ তৈরী করতে হবে। উপযুক্ত পরিমান সুষম খাদ্য প্রতিদিন খাওয়াতে হবে।
- খাদ্যের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করতে হবে।
- গাভীর আরামদায়ক শয়নের জন্য গোশালার মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিতে হবে।
- গাভীকে দিবা রাত্রি গোশালায় রেখে পালন করলে স্বাস্থ্যহানী ঘটে। তাই গাভীকে প্রতিদিন ২-৩ ঘন্টার জন্য মাঠে ছেড়ে দেয়া উত্তম। একেবারে ছেড়ে দেয়ার অসুবিধা থাকলে লম্বা দড়ি দিয়ে মাঠে বেঁধে দেয়া যায়। এ ব্যবস্থায় গাভীর ব্যায়ামের কাজ হয়।
- নবজাত বাছুরকে শালদুধ খাওয়াতে হবে। এতে বাছুরের উপকার হবে উপরন্তু গাভীর দুধ দান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। অন্যদিকে শালদুধ ওলানে থেকে গেলে গাভীর ঠুনকো রোগ হবার সম্ভবনা থাকে। দুধ দোহনের পূর্বে ওলান, বাঁট ও পিছনের অংশ অল্প গরম পানিতে ডেটল মিশিয়ে কাপড় চুবিয়ে ভালভাবে মুছে দিলে বিশুদ্ধ ও পরিস্কার দুধ পাওয়া যায়।
- দুধ দোহনকালে গাভীকে আঘাত বা বিরক্ত করা, লাল কাপড় দেখানো ইত্যাদি ঠিক নয়। আবার কোন আগন্তুক ব্যক্তি বা আশে পাশে যাতে কুকুর বিড়াল না থাকে সে দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সবের কারণে দুধ কমে যায়।

নবজাত বাছুরের যত্ন

দুগ্ধ খামারের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বাছুরের সন্তোষজনক অবস্থার উপর। নবজাত বাছুরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না। তাই নবজাত বাছুর খুবই রোগ সংবেদনশীল। এমতবস্থায় সামান্য যত্নের অভাবে বাছুরের মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই সুস্থ সবল বাছুর পেতে হলে যেমন গর্ভাবস্থায় গাভীর সুষ্ঠু যত্ন ও পর্যাপ্ত সুষম খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি প্রসবকালীন ও নবজাত বাছুরের যত্ন নেয়া আবশ্যক। প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে গাভীকে বিশেষ নজরে রাখতে হয়। কারন প্রসবকালে তেমন অসুবিধা দেখা দিলে সময়মত ব্যবস্থা নিতে হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারনত কোন রূপ সাহায্য ছাড়াই বাচা প্রসব হয়। তবে ফিটাসের বা গাভীর জননতন্ত্রের অস্বাভাবিক অবস্থায় প্রসবকালে বিঘ্ন ঘটে। এমতবস্থায় নিজে টানাটানি করে বাচা প্রসব করানো ঠিক নয়। ববং সঙ্গে সঙ্গে প্রানি চিকিৎসকের সরনাপন্ন হওয়া উচিত। সদ্যজাত বাছুরের নিম্নোক্ত ভাবে যত্ন নেয়া যায়।

১. বাচা প্রসবের পরপরই বাচার নাক ও মুখের লালা ও ঝিল্লী পরিস্কার করে দিতে হবে। নতুবা শ্বাস রুদ্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। যদি বাছুর প্রসব হওয়ার পর শ্বাস প্রশ্বাস না নেয় তবে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হবে। এক্ষেত্রে বাছুরের বুকের পাঁজরের হাঁড়ে আস্তে আস্তে কয়েক বার চাপ প্রয়োগ করতে হবে। এছাড়া বাছুরের নাক, মুখে ফুঁ দিয়েও শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করা যায়।

২. বাছুরের নাক মুখ পরিস্কারারের পর গাভীর সামনে শুকনো খড় বিছিয়ে রাখলে গাভী চেটে বাচার গা পরিস্কার করে দেয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রথম বেলায় গাভীকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখা যায়। এ অবস্থায় শুকনো নরম খড় , কাপড় অথবা চট দিয়ে বাছুরের গা ভালভাবে পরিস্কার করে দিতে হবে। কোনক্রমেই নবজাত বাছুরের শরীর পানি দিয়ে ধোয়া যাবে না। এতে বাচ্চা মারা যেতে পারে।

৩. শীতে বা অতিরিক্ত ঠান্ডায় শুকনো কাপড় বা চট দিয়ে বাছুরকে ঢেকে দিতে হবে। অথবা আগুন জ্বালিয়ে বাছুরের শরীর গরম রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বাছুরের নাভী রজ্জু দেহ থেকে ১-২ ইঞ্চি বারতি রেখে পরিস্কার জীবানু মুক্ত কাচি দিয়ে কেটে দিতে হয়। কাটার পর স্থানটিতে টিংচার আয়োডিন লাগাতে হবে। এর ফলে নাভীরজ্জু দিয়ে দেহে রোগ জীবানু প্রবেশ করতে পারেনা। নাভীরজ্জু বেঁধে না দেওয়াই ভাল।

৫. সুস্থ সবল বাছুর জন্মের ১৫ মিনিটের পর থেকেই উঠার চেষ্টা করে এবং দুধ খেতে সক্ষম হয়। অনেক সময় বাছুর দাঁড়াতে ও দুধ খেতে পারে না। এ অবস্থায় বাছুরকে দাড়াতে এবং দুধ খেতে সাহায্য করতে হবে। প্রসবের ১-২ ঘন্টার মধ্যে বাছুরকে তার মায়ের শাল দুধ খাওয়াতে হবে। এই দুধ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই খাওয়ানো উচিত। বাছুরের প্রতি ১০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ১ কেজি শাল দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। যদি বাছুর কোন রোগ দুর্বলতার কারনে দাঁড়াতে বা দুধ খেতে না পারে তবে বোতলে নিপল লাগিয়ে দুধ খাওয়াতে হবে।

৬. গ্রামাঞ্চলের অনেকে অজ্ঞতা বসতঃ বাচা প্রসবের পর গাভীর প্রথম দুধ বা শালদুধ খেতে না দিয়ে ফেলে দেয়। এটি বিজ্ঞান সম্মত নয়।

নবজাত বাছুরের প্রথম খাবার হিসেবে শালদুধ নিম্নোক্ত কারনে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ন

- স্বাভাবিক দুধের চেয়ে শালদুধে ৩-৫ গুন অধিক প্রোটিন থাকে। এই প্রোটিনের অধিকাংশ রোগ প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে।
- নবজাত বাছুরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধের কোন ক্ষমতা থাকে না। তাই বাছুরের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শালদুধ বাছুরকে রোগের কবল থেকে রক্ষা করে।
- স্বাভাবিক দুধের চেয়ে শালদুধে ৫-১৫ গুন অধিক ভিটামিন থাকে।
- বাছুরের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ শালদুধে যথেষ্ঠ পরিমানে থাকে।
- শালদুধ একটি রেচক পদার্থ হিসেবে নবজাতক বাছুরের পরিপাক তন্ত্রে যে হলুদ বর্নের বিপাক জাত মল জমে থাকে তা বের করে দিয়ে খাদ্য অন্ত্রককে পরিস্কার করে।
- বাছুরের জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহ প্রতিটি বাছুরকে পৃথক ভাবে খাঁচার মেঝেতে শুষ্ক খড় বিছিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বাছুরের বদ হজম বা পাতলা পায়খানা হলে দুধ খাওয়ানোর পরিমান অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হবে। এছাড়া দুধকে প্রথমে ফুটিয়ে ও পরে ঠান্ডা করে দেহের তাপ অনুযায়ী খাওয়াতে হবে।
- প্রসবের পরপরই কোন কারনে গাভীর মৃত্যু ঘটলে বাছুরকে অন্য গাভীর শাল দুধ খাওয়ানো যায়।

দুধ দোহন পদ্ধতি

প্রধানত বাছুরের সহায়তায় হাতের মাধ্যমে ও দুধ দোহনের যন্ত্রের সাহায্যে গাভীর দুধ দোহ করা যায়। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে হাতের সাহায্যে দুধ দোহন করা হয়। এছাড়া বৃহৎ খামারে বিদেশী জাতের গাভী দোহনের জন্য যন্ত্রের সাহায্য নেয়া হয়।

(ক) হাতের সাহায্যে দুধ দোহন

গাভীর সাধারণত বাম পার্শ্বে থেকে দুধ দোহন করা হয়। বাটে দুধ আসর সাথে সাথে দুধ দোহন কাজ শুরু করতে হয়। সাধারণত স্ট্রাইপিং এবং ফুল হ্যান্ড পদ্ধতিতে তর্জনী ও বুড়ো আঙ্গুলের সাহায্যে দুধ দোহন করা যায়। ফুল হ্যান্ড পদ্ধতিতে হাতের পাচটি আঙ্গুল ও হাতের তালুর চাপের মাধ্যমে দুধ দোহন করা হয। অনেক দুধ দোহনকারী বুড়ো আঙ্গুল বাঁকা করে দুধ দোহন করে । এই পদ্ধতিতে দুধ দোহন ঠিক নয়। কারণ এই রূপ দুধ দোহনে বাঁটে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। অজ্ঞতাবশতঃ গ্রামঞ্চলে অধিকাংশ গোয়ালা দোহন কার্যে সুবিধার জন্য আঙ্গুলে দুধ পানি বা থুথু লাগিয়ে দুধ দোহন করে। এরূপ করা কোনক্রমে ঠিক নয়। কারণ এইরূপ স্বাস্থ্যসম্মত নয়। এছাড়া এতে বাঁটের ত্বক ফাটার সম্ভাবনা থাকে। তাই শুষ্ক আঙ্গুলে দুধ দোহন সর্বোত্তম। তবে বাঁটে ক্ষত থাকলে জীবানুনাশক মলম বা ক্রিম ব্যবহার করে দুধ দোহন করা যায়।

(খ) স্ট্রিপ কাপ (Strip Cup)

গাভীর বাঁটে দুধ দোহানো যন্ত্রের টিপ কাপ লাগানোর পূর্বে একটি প্রধানত নিম্নাক্ত তিনটি কারণে প্রতিটি বাঁট থেকে দুধ টেনে দেখা প্রয়োজন। বাটেঁর বেষ্টক পেশী উন্মুক্ত করে ফলে দ্রুত দুধ বের হয়। দুধকে অতিরিক্ত ব্যাকটেরিয়া থেকে মুক্ত করে। অস্বাভাবিক দুধের উপস্থিত সনাক্ত করা যায়। যে গাভীর অস্বাভাবিক দুধ হবে সে গাভীকে ম্যাস্টইটিস রোগের জন্য পরীক্ষা করতে হবে। এবং সবশেষে দুধ দোহন করতে হবে।

গাভীর বন্ধ্যাত্বের কারণ সমূহ আলোচনা

একজন গাভী পালনকারীর নিকট সময়মত গাভীর গর্ভধারণ অত্যন্ত জরুরী । সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতাকে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা বলে । একটি গাভীকে বিভিন্ন কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দিতে পারে । যেমন-

১। গঠনজনিত

শরীরের অনেক জন্মগত বা বংশগত ত্রুটিজনিত কারণে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা হয় । যেমন-ডিম্বাশয়,গর্ভাশয়,সার্ভিক্স ইত্যাদির অস্বাভাবিকতা। গাভীর জমজ বাচ্চা জন্মের ফলে একটি এঁড়ে অন্যটি বকনা হলে সাধারণতঃ ৯১% ভাগ ক্ষেত্রে বকনা বাছুরটি বন্ধ্যা হতে দেখা যায় ,একে ইংরেজীতে ফ্রি-মার্টিন বলে । অনেক গবাদিপ্রাণিতে আবার জনন অংগের কোন একটি অংশ থাকে না বা ঠিকমত বিকাশ লাভ করে না,এসব ক্ষেত্রেও গবাদিপ্রাণি বন্ধ্যা হয় । ক্রোমোজম সংখ্যার তারতম্য হলেও গবাদিপ্রাণি বন্ধ্যা হয় ।

২। দুর্ঘটনাজনিত

প্রজনন তন্ত্রে যে কোন ধরনের আঘাতের ফলে অথবা জরায়ুর বহির্গমন,যোনির বহির্গমন ইত্যাদির কারণে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হতে পারে ।

৩। শরীর বৃত্তীয়কার

বিভিন্ন হরমোনের অভাব ও অনিয়মিত ক্ষরণের ফলে গাভীতে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা দেয় । যেমন-ফলিকুলার ষ্টিমুলেটিং হরমোন,লিউটিনাইজিং হরমোন,প্রোজেষ্টেরন হরমোন ইত্যাদি । এছাড়াও ডিম্বাশয়ের বিভিন্ন রোগ যেমন-স্থায়ী করপাস লিউটিয়াম,সিষ্ট,ফলিকুলার এট্রফি ইত্যাদি ।

৪। পুষ্টিগত

সুষম খাদ্যের অভাবে গাভীতে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায় । যেমন-ভিটামিন-এ, ডি, ই ও খনিজ পদার্থের মধ্যে ফসফরাস,কপার,কোবাল্ট ইত্যাদির অভাবে গাভীতে বন্ধ্যাত্বের কোন প্রমান নাই তবে ফসফরাস শরীরের কাজে লাগার জন্য খাদ্যে ক্যালসিয়াম অপরিহার্য । গবাদিপ্রাণির খাদ্যে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের অনুপাত ১ঃ২ থেকে ২ঃ১ হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

৫। মনস্তাত্বিক

ভয় বা স্নায়ুবিক উত্তেজনার ফলে গবাদিপ্রাণির গর্ভধারণ বিঘ্নিত হতে পারে । বিশেষতঃ বকনার ক্ষেত্রে প্রজনন ভীতি বা অস্থিরতা অথবা মাত্রাতিরিক্ত উত্তেজনার বশে এ ধরনের অনুর্বরতা দেখা যায় ।

৬। রোগজনিত

বিভিন্ন সংক্রামক যৌন রোগ যেমন-ব্রসোলোসিস, ট্রাইকোমোনিয়াসিস,ভিব্রিওসিস,লেপটোসপাইরোসিস ইত্যাদি রোগ অথবা জনন তন্ত্রের অন্যান্য রোগ,যেমন-মেট্রাটিস,সার্ভিসাইটিস,পায়োমেট্রা,সালফিনজাইটিস ইত্যাদি রোগে গাভী বন্ধ্যা বা অনুর্বর হয় ।

৭। বংগত

অনেক সময় বংশগত কারণে গবাদিপ্রাণিতে বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা দেখা যায় । যেমন- ফ্রি-মারটিন বা হোয়াইট হেইফার ডিজিজ হলে গবাদিপ্রাণি বন্ধ্যা হয় ।

৮। ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা

লালন-পালন ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটির কারণে বন্ধ্যাত্ব ও অনুর্বরতা দেখা যায় । যেমন-অযত্ন,অবহেলা,অপর্যাপ্ত খাদ্য,অনিয়মিত দুধ দোহন,প্রসবকালীন অবহেলা,অযত্ন বা ত্রুটি ইত্যাদি ।

৯। অন্যান্য

বিভিন্ন বিষয় যেমন- গবাদিপ্রাণির বয়স, ঋতু,তাপমাত্রা,আলো ইত্যাদি গবাদিপ্রাণির উর্বরতার উপর প্রভাব বিস্তার করে । সাধারণতঃ ৪ বছর বয়স পর্যন্ত গাভীর উর্বরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ও ৬ বছর পর্যন্ত তা বিরাজ থাকে । কিন্তু ৬ বছর পর থেকে উর্বরতা হ্রাস পেতে থাকে । গাভী সাধারনতঃ বাড়ন্ত কালে অধিক উর্বর থাকে ।

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতার লক্ষণ

- গাভী বাচ্চা প্রসবের ৯০-১০০ দিনের মধ্যেও গরম হয় না ।
- সব সময় গরম থাকে বা অনিয়মিত ভাবে গরম হয় ।
- ১৫ দিনের কম সময় ও ২৮ দিনের বেশী সময় পর পর গরম হয় ।
- দীর্ঘদিন অর্থাৎ গাভী এক বছর বা অধিক সময় গরম না হওয়া ।
- স্ত্রী প্রজনন তন্ত্র থেকে ঘোলা পুঁজ বা রক্ত মিশ্রিত মিউকাস নির্গত হওয়া ।
- গর্ভপাত হওয়া ।
- তিন বারের অধিক প্রজননের পরও গর্ভধারণ না করা । গর্ভফুল না পড়া, জরায়ুর বহির্গমন, যোনির বহির্গমন ইত্যাদি ।

বন্ধ্যাত্ব বা অনুর্বরতা প্রতিকারের উপায়

- স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনায় গাভী লালন পালন করতে হবে ।
- সুষম খাদ্য খাওয়াতে হবে ।
- সঠিকভাবে গাভীর গরমকাল নির্ধারণ করে সময়মত প্রজননের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- প্রজনন তন্ত্রে কোন অসুখ থাকলে সময়মত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ।
- প্রসবের সঠিক যত্ন নিতে হবে ।
- প্রসবের পর কমপক্ষে ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পূনরায় প্রজনন করাতে হবে ।
- সংক্রামকরোগ থাকলে তার চিকিৎসা করাতে হবে । ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে মেরে ফেলতে হবে
- নির্বাচিত গাভীর প্রজনী জন্ম হওয়ার পর তাকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন তথ্য ছক সংরক্ষন করতে হবে।

প্রজেনী তথ্য সংরক্ষনের ছক

ক্রমিক নং	বাচ্চার জন্মের তারিখ	বাচ্চার জন্মকালীন ওজন	বাচ্চার লিঙ্গ	বাচ্চার জাত ও নাম্বার	মায়ের জাত ও নাম্বার	বাবার জাত ও নাম্বার	মাতার মোট দুধ উৎপাদন	প্রজনন বয়স ও তারিখ	বাচ্চা দানের বয়স	দৈনিক দুধ উৎপাদন	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২

গাভীর দানাদার খাদ্য ব্যবস্থাপনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

আমাদের দেশের কৃষকরা গবাদিপ্রাণির খাদ্যের বিষয়ে তেমন সচেতন নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় যে, গবাদিপ্রাণির খাবারের বিষয়ে তেমন কোন নিয়ম কানুনের তোয়াক্কা করেন না। এতে করে গবাদিপ্রাণির বাড়বাড়তি এবং দুধ উৎপান কম হয়। অনেকেই গবাদিপ্রাণি ওজন অনুসারে কি কি খাবার কি পরিমাণ লাগবে সে বিষয়ে কোন ধারনা নাই। এই সেশনে গবাদিপ্রাণির খাবার বিষয়ে কৃষকদেরকে ধারনা দেয়া হবে।

উদ্দেশ্য

- গাভী পালনে দানাদার খাদ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।
- দুধ উৎপাদনে খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।
- নিজ হাতে দানাদার খাদ্য দিয়ে রেশন তৈরি করতে সক্ষম হবেন।

সময় : ১.৩০ মিনিট

উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন প্রকার খাবারের নমুনা।

পদ্ধতি : প্রশ্নোত্তর, অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও ব্যবহারিক।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে গাভীর দানাদার খাদ্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের গাভীর দানাদার খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- গাভী সাধারণত কি কি ধরণের খাবার খায়?
- প্রতিদিন কতটুকু ঘাস ও খড় দিতে হয়?
- গাভী দানাদার খাদ্য কতটুকু দিতে হয়?
- দানাদার খাবার তৈরীতে কি কি উপকরণ ব্যবহার করেন?
- দৈনিক কি পরিমাণ খাবার দুধের গাভীর জন্য খাওয়ানো হয়?
- দৈনিক কি পরিমাণ খাবার গাভীর জন্য খাওয়ানো হয়?
- দানাদার খাবার এ লাভ কি? এ খাবার আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি কি?
- আপনি আপনার গরুকে কি কি খাদ্য দেন?
- খাদ্যকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?
- রেশন কি? গাভী পালনে রেশন এত গুরুত্ব পূর্ণ কেন?
- ১ কেজি দানাদার খাদ্য তৈরির জন্য কি কি উপাদান কি হারে প্রয়োজন?
- গরুকে দৈনিক কতটুকু করে দানাদার খাদ্য দিতে দিতে হবে?

অংশগ্রহণমূলক আলোচনা করে প্রশ্নের উত্তর বাহির করুন, উত্তরের জন্য সময় দিন, প্রয়োজনে সহায়তা করন। গবাদিপ্রাণির খাদ্য ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নমুনা প্রদর্শন করুন এবং উন্নত খাদ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মতামত নিন, ধারনাগুলো পরিস্কার করুন এবং প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।

কারিগরি নোট

ভূমিকা

শষ্য দানা, কৃষি শিল্পের উপজাত, লাল গুড় ইত্যাদি। দানাদার খাদ্য মিশ্রণ সু-পাচ্য, পুষ্টিকর উপাদান (আমিষ, শর্করা, চর্বি) সমৃদ্ধ। এ শ্রেণীর খাদ্যে আর্দ্রতার পরিমাণ কম। কাজের বলদ থেকে সঠিক কাজ, দুগ্ধবতী গাভী থেকে অধিক দুধ ও গর্ভবতী গাভী/ছাগীর/ভেড়ীর গর্ভস্থ বাচার দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কাঁচা ঘাসের পাশাপাশি অবশ্যই দনাদার খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

গবাদিপ্রাণি যে সব খাদ্য উপাদান খেয়ে জীবন ধারণ করে সেসব খাদ্যকে গবাদিপ্রাণি খাদ্য বলা হয়। অথ্যাৎ দৈহিক বৃদ্ধি, পুষ্টিসাধন ও উৎপাদনের জন্য গবাদিপ্রাণি যে সকল স্বাভাবিক উপাদন বা বস্তু খায় তাদের গবাদিপ্রাণির খাদ্য বা খাদ্য উপাদান বলে বলে। বিভিন্ন গবাদিপ্রাণির দৈহিক প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যের প্রয়োজন হয়। গবাদিপ্রাণি খাদ্য নিম্নোক্ত কারনে গুরুত্বপূর্ণ।

(১। স্বাস্থ্য সংরক্ষণ গবাদিপ্রাণির দেহের তাপ সংরক্ষণ, শক্তি উৎপাদন, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও সর্বোপরি জীবন ধারনের জন্য খাদ্য অপরিহার্য্য।

(২) দৈহিক বৃদ্ধিসাধন বাড়ন্ত গবাদিপ্রাণির সুষ্ঠুভাবে দৈহিক বৃদ্ধির জন্য খাদ্য আবশ্যক।

(৩) দুধ উৎপাদন গবাদিপ্রাণির দুধ উৎপাদনের পরিমাপের উপর গবাদিপ্রাণি খাদ্যের উপাদান ও পরিমাণ বৃদ্ধি আবশ্যক । অথ্যাৎ গাভীকে খাদ্য সরবরহের উপর তার দুধের পরিমাণ ও মান নির্ভর করে।

(৪) প্রাত্যহিক কর্মক্ষমতা গবাদিপ্রাণির কাজের ধরণ ও পরিশ্রমের উপর গবাদিপ্রাণি খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন অথ্যাৎ গবাদিপ্রাণির শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যের দরকার পড়ে।

(৫) মাংস ও উল উৎপাদন গবাদিপ্রাণির মাংস ও উল প্রোটিনযুক্ত। তাই উৎকৃষ্ট মানের মাংস ও উলের জন্য উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ প্রয়োজন। সুষম খাদ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছয় প্রকার খাদ্য উপদান থাকে । যথা

(কা) পানি, (খ) শর্করা, (গ) আশিষ, (ঘ) চর্বি, (ঙ) খানিজ পদার্থ, (চ) খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন)।

গবাদিপ্রাণির খাদ্যের শ্রেণীবিভাগ

গবাদিপ্রাণির খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী গবাদিপ্রাণি খাদ্যে সামগ্রীকে প্রধানত নিম্নোক্ত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

(১) আশওয়ালা খাদ্য

(ক) সরস আঁশওয়ালা খাদ্য : (অ) চারণ ঘাস, (আ) চাষকৃত সবুজ ঘাস, (ই) গাছের পাতা , (ঈ) শিকড় ফসল , (উ) সাইলেজ ইত্যাদি।

(খ) শুল্ক আশ যুক্ত খাদ্য : (অ) খড়, (আ) শুল্ক ঘাস ।

(২) দানাদার খাদ্য

(ক) এনার্জি সমৃদ্ধ সারবান খাদ্য : (অ) শস্যদানা, (আ) কৃষি শিল্পের উপজাত, (ই) মল ও কন্দ জাতীয় খাদ্য, (ঈ) লালি গুড় ইত্যাদি।

(খ) প্রোটিন সমৃদ্ধ সাবরান খাদ্য : (অ) উদ্ভিদ প্রোটিন এবং (আ) প্রাণীজাত প্রোটিন্য।

(৩) অ্যাডেটিভস

(ক) ভিটামিন সরবরাহ, (খ) খনিজ পদার্থ সরবরাহ, (গ) অ্যান্টিবায়েটিক এবং আনোবোলিকস।

(১) আশওয়ালা খাদ্য

যে সকল গবাদিপ্রাণি খাদ্য উচ্চ মাত্রায় তন্ত বা আঁশ এবং নিম্ন মাত্রায় মোট হজমী উপাদান থাকে তাদের আঁশওয়ালা খাদ্য বলে। যেমন সবুজ ঘাস, হে ইত্যাদি। আঁশওয়ালা খাদ্যের মধ্যে কম হজমী দ্রব্যই বেশি থাকে। এ শ্রেণির খাদ্যে শতকরা ১৮ ভাগের অধিক আঁশ। এছাড়া শক্তিকারক খাদ্য উপাদন খুব অল্প শাত্রায় থাকে।

রসদ বা রেশন

গবাদিপাণিকে দৈনিক অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য বা খাদ্য সমষ্টি খেতে দেয়া হয় তাকে রসদ বা রেশন বলে। দৈনিক চাহিদা ও উপৎপাদনের উপর ভিত্তি করে গবাদিপাণি খাদ্যকে নিম্নোক্ত কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ।

(১) সুষম খাদ্য : যেসব খাদ্য গবাদিপ্রাণি দেহের দৈনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ও অনুপাতের সব রকম পুষ্টিকর উপাদান থাকে তাকে সুষম খাদ্য বলে। প্রতিটি গবাদিপাণির জন্য সুষম খাদ্যেও প্রয়োজন। কারণ সুষম খাদ্যেও অভাব হলে গবাদিপ্রাণি তার প্রয়োজন অনুযায়ী পুষ্টিকর উপাদান পায়না ফলে তার দহ গঠন ও উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

(২) স্বাস্থ্য রক্ষার খাদ্য : গবাদিপ্রাণি স্বাভাবিক স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরবৃত্ত বিষয়ক কার্যাবলী যথা শ্বাস-প্রশ্বাস, রক্তসঞ্চালন, পরিপাক ক্রিয়া ইত্যাদি পরিচালনার জন্য শক্তি যোগান দেয় যে খাদ্য তাকে স্বাস্থ্য রক্ষণ খাদ্য বলে।

(৩) উৎপাদক খাদ্য : গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেমন একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন তেমনি তার উৎপাদনের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। আবার উৎপাদনের ধরন ও পরিমাণের উপর খদ্যের ধরণ ও পরিমাণ নির্ভর করে। যেমন- দুগ্ধবর্তী গাভীর দুধ উৎপাদন, গর্ভবতী গাভীর গর্ভস্থ বাচ্চার দৈহিক বাড়ন, বাচ্চা গবাদিপ্রাণির দৈহিক বৃদ্দি এবং গবাদিপ্রাণির লাঙ্গল ও গাড়ি টানা, ভার বহন ইত্যাদির জন্য বিভিন্ন ধরনের সুনিদিষ্ট বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন। সুতারাং গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষার উপযোগী খাদ্য ছাড়াও গবাদিপ্রাণির উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত যে খাদ্যের প্রয়োজন হয় তাকে উৎপাদক খাদ্য বলে।

খাদ্যের পুষ্টি নির্ণয়

খাদ্যের পুষ্টি নির্ণয়ের জন্য প্রধানত শক্তি উৎপাদী ক্ষমতা এবং খাদ্যে প্রোটিনের প্রয়োজন।

(১) মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদান

গবাদিপ্রাণি যে খাদ্য খায় তার কিছু অংশ দেহে শোষিত হয় এবং বাকি অংশ মলের আকরে বের হয়ে যয়। খাদ্যের যে অংশটুকু দেহের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিপাক হয় তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে তাকে মোট সুপাচ্য পুষ্টি উপাদান বলে। মোট সুপাচ্য পুষ্টি উৎপাদনেকে শতকরা হিসেবে প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতি অনুসারে এক কেজি সুপাচ্য কার্বোহাইড্রেট এক কেজি সুপাচ্য প্রোটিনে সমান এবং এক কেজি সুপাচ্য ফ্যাট ২.২৫ কেজি সুপাচ্য কার্বোহাইড্রেট বা প্রোটিনের সমান তাপ উৎপন্ন করে।

(২) সুপাচ্য ক্রুড প্রোটিন

সব খাদ্যে প্রটিনের পরিমাণ এক রূপ নয়। কোন খাদ্যে অধিক পরিমাণে প্রোটিণ থাকলেও সবটুকু দেহে শোষিত হয়না। কিংবা দেহের প্রয়োজনে আসেনা। তাই প্রত্যেক খাদ্যের প্রোটিন কতটুকু হজম হয়ে দেহের প্রয়োজনে লাগে তা জানা প্রয়োজন। কোন খাদ্যে প্রটিনের যতটুকু অংশ, পরিপাক হয়ে দেহের কাজে লাগে তাকে সুপাচ্য ক্রুড প্রোটিন বলে।

আদর্শ রেশনের বৈশিষ্ট্য

- রেশন অবশ্যই সুষম হতে হবে
- খাদ্য সহজপাচ্য হওয়া প্রয়োজন।
- খাদ্য রেচকগুণ সম্পর্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- খাদ্য রুচিকর সুস্বাদু হতে হবে।
- খাদ্যে সুঘ্রাণে দুধ উৎপাদনের সহায়ক হয়।
- খাদ্য বিভিন্ন প্রকর দ্রব্য সমন্বয়ে হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- সহজলভ্য ও অপেক্ষাকৃত সস্তা হতে হবে।

গবাদিপ্রাণি খাদ্য তালিকা

গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, দৈহিক বৃদ্ধি, বাচ্চা ও দুধ উৎপাদন এবং প্রাতহিক কর্মক্ষমতার জন্য বিভিন্ন খাদ্য উপাদান যেমন পানি, শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন সমন্বয়ে সুষম খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন ।

১০ কেজি দানাদার খাদ্য প্রস্তুতি

ক্রমিক নং	উপাদান	পরিমাণ
১	গমের ভুষি	৪ কেজি
২	চালের কুড়া	২ কেজি
৩	ডালের ভূষি	১.৫ কেজি
৪	খৈল	২ কেজি
৫	লবন	২০০ গ্রাম
৬	ঝিনুকের গুড়া	৩০০ গ্রাম
মোট		১০. ০০ কেজি

টেবিল : প্রতিদিন প্রয়োজন (কেজি) গরু ও মহিষের খাদ্য তালিকা

ক্রমিক নং	গবাদিপ্রাণি	শ্রেণী/জাত	প্রতিদিন প্রয়োজন কেজি)		
			কনসেন্ট্রেট	সবুজ ঘাস	শুল্ক ঘাস
০১	দুগ্ধবতী গাভী (গরু)	সংকর	২.৭৫০	২০.০০	৬.০০
০২	দুগ্ধবতী গাভী (গরু)	ভাল দেশী	১.২০০	১০.০০	৬.০০
০৩	দুধ বিহীন গাভী (গরু)	সংকর/দেশী	০.১২৫	০৩.৫০	৩.১৬

টেবিল ঃ বিভিন্ন গবাদিপ্রাণি খাদ্যের পুষ্টিমান

ক্রমিক নং	গবাদিপ্রাণি খাদ্য	প্রোটিন	চর্বি	ফাইবার	নাঃ ফ্রি এঃ (NFE)	খনিজ পদার্থ (Ash)	ড্রাই ম্যাটার (DM)
১.	নেপিয়ার (সবুজ)	০.২.৪৭	০০.৪৭	০৬.৫১	০৭.৯৪	০২.১৪	১৯.৭১
২.	বার্জা (Bajra)	০০.৫৬	০০.৪৬	০৬.৫২	০৭.৪৬	০২.২০	১৯.২০
৩.	প্যারা ঘাস	০২.৪০	০০.৫২	০৬.৫০	১০.৪৩	০২.৩৭	২০.২২
৪.	রাস্তার পার্শ্বের ঘাস	০১.৪৮	০০.৪০	০৭.৫৬	০৮.৫৩	০৩.৭৮	২০.৭৫
৫.	ধানের খড়	০৩.৫০	০১.২৩	৩২.১৫	৩৯.৩৩	১৩.২৯	৮৯.৫০
৬.	ধানের তুষ	১৪.১২	১৩.১০	১১.৯৭	৪০.৮৬	১১.৪৫	৯১.৪৯
৭.	ধানের কুড়া	১৪.৮০	১২.৮০	১০.৬৩	৪২.৮৮	১২.১০	৯১.২১
৮.	গমের ভূষি	১৩.৩৭	০৩.৮০	১২.১২	৫৪.৬৪	০৫.৭৫	৮৯.৭১
৯.	ধান	০৮.১০	০১.২৩	০০.৯২	৭৭.৭৮	০১.০০	৮৯.০৩
১০.	গম	১২.৮০	০১.৬০	০৩.০১	৭০.০৯	০১.৯২	৮৯.৮০
১১.	ভূট্টা	০৯.২৭	০৩.৫২	০২.৫০	৪৩.৩১	০১.৬৯	৯০.২১
১২.	খেসারী	২৭.১১	০১.১৫	০৭.৪৮	৫১.৩৫	০৩.২১	৯১.১০
১৩.	মাসকলাই	২৭.৪১	০৩.২৭	০৬.৩৩	৪৭.৫৯	০৩.৭০	৮৮.৩০
১৪.	চোলা	২০.১৫	০২.৭১	০৯.২৩	৫৬.৬২	০৩.০০	৯১.৭১
১৫.	তিলের খৈল	৩১.৪৭	০৭.৯৬	০৭.৩৯	৩৯.৮৮	১২.৬০	৯৯.৩০
১৬.	সরিষার খৈল	৩২.০২	১১.৩৪	০-৮.২৪	২৪.৩১	০৯.৬০	৮৯.৫১
১৭.	তিসির খৈল	৩০.৪৫	০৬.০৮	০৮.৬১	৩৫.২৮	১০.১০	৯০.৫২
১৮.	ফিস মিল	৫৪.৪৩	০৯.৮২	০০.৬০	০৫.১৪	১৮.০১	৮৮.০৪

উন্নত ঘাস চাষ পাকচং/ নেপিয়ার/জাম্বু/লুসার্ন বা আলফা আলফা/জার্মানী

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

নোয়াখালীর চর বলতে বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার নদীমাতৃক দ্বীপসমূহকে বোঝায়, যেগুলো প্রায়ই লবণাক্ত প্রবণ এলাকা, সীমিত আবাদি জমি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকির দ্বারা চিহ্নিত। নোয়াখালীর চরের এলাকায় গবাদিপ্রাণি উৎপাদনের জন্য প্রাণি খাদ্য প্রদর্শন করা প্রয়োজন যা পরিবেশের দ্বারা সৃষ্ট নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ এবং গবাদিপ্রাণির জন্য পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করবে।

উদ্দেশ্য

- চর অঞ্চলের উপযোগি উন্নত জাতের ঘাস চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবো।
- ঘাসের উন্নত জাতসমূহ সম্পর্কে জানবো ও চিনবো।
- গবাদিপ্রাণির খাদ্য হিসাবে ঘাস চাষ খুবই সাশ্রয়ী।
- ঘাস চাষ খামারীর আয় মূলক কাজ হিসাবে ভূমিকা রাখবে।
- এলাকায় ঘাস চাষে অন্যান্য খামারীকে উদ্বুদ্ধ করা
- হাতে কলমে ঘাস চাষ কৌশল শিখবে

সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

উপকরণ: ম্যানিলা পেপার, মার্কার, উন্নত জাতের বিভিন্ন ঘাসের নমুনা/বীজের নমুনা, আবাদের জন্য উন্নত জাতের যেকোন ঘাসের বীজ বা কাটিং, কোদাল, সার, পানি দেয়ার জন্য বালতি বা ঝরণা ইত্যাদি।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর ও ব্যবহারিক।

সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন এবং অংশগহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে উন্নত জাতের ঘাসের গুরুত্ব আলোচনা করবেন।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- উন্নত জাতের ঘাস সম্পর্কে জানেন কি না?
- চর অঞ্চলের উপযোগি কি কি ঘাস চাষ করা যায় ?
- উন্নত জাতের ঘাস আমরা কেন খাওয়াব?
- কোন জমিতে কোন জাতের ঘাস ভালো হয়?
- কোন কোন স্থানে ঘাস চাষ করা যায়?

- ঘাসের কাটিং বা বীজ কিভাবে লাগাতে হয়?
- ঘাস জমিতে লাগানোর পর কিভাবে যত্ন নিতে হয়?
- ঘাস কতদিন বয়স হলে কাটতে হয়?
- এ অঞ্চলে ঘাসের বাজারজাত করা যাবে কিনা ?
- ঘাস সংরক্ষণ প্রয়োজন আছে কিনা ?
- সংরক্ষণ করলে কিভাবে করেন?

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করুন এবং সাথে আপনার ধারনাসমুহ যোগ করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা শুরু করুন অথবা আলোচনা করতে সহায়তা করুন।

পাকচং ঘাসের কাটিংও আলফা আলফা বীজের এর নমুনা দেখিয়ে উন্নত জাতের ঘাসসমূহ অংশগ্রহণকারীদেরকে চিনিয়ে দিন।
অংশগহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতের ঘাস চাষের কৌশল আলোচনা করুন।

কারিগরি নোট

ভুমিকা

বাংলাদেশে জমির সীমাবদ্ধতার কারণে গবাদিপ্রাণির তেমন চারণ ভূমি নাই। তাই দেশের গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট ডেয়রী খামার গড়ে উঠেছে।

(আ) চাষকৃত সবুজ ঘাস

সাধারণত চারণ ভূমির অভাবে প্রাণীর খাদ্য ফসলের জমিত উৎপাদন করা হয়। প্রধানত দু'ধরনের প্রাকৃতিক ঘাস চাষ করা হয়। যথা লেগুম যুক্ত ঘাসএবং অ-লেগুম ঘাস। লেগুমযুক্ত ঘাস যে সকল ঘাসের শিকড়ে নডিউল থাকে এবং এই নডিউলে রাইজোবিয়াম জীবানু বায়ূ মন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চিত করে রাখে তাদের লেগুমযুক্ত ঘাস বলে। নাইট্রোজেনযুক্ত এই লেগুম ঘাস গবাদিপ্রাণি খাওয়ালে অতিরিক্তি কোন প্রোটিন খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। লেগুম ঘাসের মধ্যে বরবটি, গুয়ার , বারসীম, লুসার্ন, মটর মাসকলাই, খেসারী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বারসীমা ও লুসার্ন ঘাস প্রাণিকে অধিক পরিমানে খাওয়ালে প্রাণির পেটফোলা রোগ হবার সম্বাবনা থাকে। তাই উক্ত ঘাস শুল্ক ঘাসের সথে মিশিয়ে গবাদিপ্রাণিকে খাওয়ানো প্রয়োজন হয়।

অ-লেগুম ঘাস

সে সকল ঘাসের শকড়ে কোন নডিউল থাকে না এবং তেমন কোন নাইট্রোজেন সঞ্চিত করে রাখতে পারে না তাদের অ-লেগুম ঘাস বলা হয়। তাই গবাদিপ্রাণিকে এ জাতের ঘাস খাওয়লে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন হয়। খাদ্য শস্যের ঘাস প্রধানত অ-লেগুম জাতীয় । যেমন-: ধান, ভূট্টা, জোয়ার, বাজরা প্রভৃতি অ-লেগুম জাতীয় শস্য ঘাস। এছাড়া ঘাসের মধ্যে পারাঘাস। গিনিঘাস, নেপিয়ার ঘাস সরগম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য অ-লেগুমজাতীয় ঘাস।

মূল জাতীয় ফসল

সাধারণত ইউরোপে শীতকালে সরস খাসের অবাবে পশুকে মালগম, ওলকপি, মূলা, গাজর প্রভৃতি খাওয়ানো হয়। বাংলাদেশে অধিক দুধ লাভের আশায় গাভীকে মিষ্টি আলু খাওয়ানো হয়।

ঘাসের চাষ ও এর ব্যবস্থাপনা

ঘাস এক ধরণের সবুজ উদ্ভিদ যা গবাদিপ্রাণি খেয়ে জীবন ধারণ করে এবং তার দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। আমাদের দেশে গবাদিপ্রাণি সাধারণত সবুজ ঘাস, লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রাকৃতিকভাবে উৎপন্ন খাদ্যের একমাত্র উৎস হছে চারণভূমি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে তেমন কোন চারণ ভূমি নেই। সাধারণত উপকুলীয় চর, নদীর চর, পাহাড়ী অঞ্চল, বন্যার বাঁধ, পুকুর পাড়, রাস্তার ধার, ফসল কাটা মাঠ ইত্যাদি স্থানে গরু মহিষ, ছাগল, ভেড়া চরে বেড়ায়। এসব স্থানে প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ঘাসই গবাদিপ্রাণির অন্যতম খাদ্যের উৎস। সুতরাং, পরিকল্পিতভাবে ঘাস চাষ করলে এসব স্থানে ঘাসের উৎপাদন তথা গবাদিপ্রাণির খাদ্য সরবরাহও অনেক বেড়ে যায়।

কেন আমরা ঘাস চাষ করব?

- ঘাস প্রাণির অন্যতম প্রধান খাদ্য
- ঘাস প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত হয়
- ঘাস খাওয়ালে গবাদিপ্রাণির খাদ্য খরচ কম হয়
- ঘাসে প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যায়
- ঘাস গবাদিপ্রাণির উৎপাদন বৃদ্ধি (দুধ ও মাংস) করে
- ঘাস অনেক রোগ প্রতিরোধ করে
- কৃষক/খামারীর ঘাস বিক্রি করে বাড়তি আয় করতে পারে
- পতিত জমিতে ঘাস চাষ করে অর্থনিতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়
- জমির ধরন অনুযায়ী ঘাস চাষ করা যায়
- ঘাস থেকে গবাদিপ্রাণি পুষ্টি পেয়ে থাকে
- অতীতে আমাদের দেশে চারণ ভূমি ছিল যেখানে গবাদিপ্রাণি তার প্রয়োজনীয় সবুজ ঘাসের চাহিদা মিটাত।

বর্তমানে আমাদের দেশে তেমন কোন চারণ ভূমি নেই। তাই গবাদিপ্রাণির সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটাতে কৃষকদের পরিকল্পিত ভাবে উচ ফলনশীল ঘাসের চাষ/আবাদ করতে হবে। নিম্নে এইরূপ অধিক উৎপাদনশীল ও খাদ্যমান সম্পন্ন কয়েকটি ঘাসের চাষ পদ্ধতি আলোচনা করা হল :

পাকচং/সুপার নেপিয়ার/স্মাট নেপিয়ার : এটি বহুবর্ষী ঘাস, একবার লাগালে ৩-৪ বছর পর্যন্ত ঘাস উৎপন্ন হয়।

রোপনের সময় : উৎকৃষ্ট সময় ফাল্গুণ-চৈত্র মাস। তবে যে কোন সময় লাগানো যায়।

মাটির ধরণ : বাংলাদেশের সব ধরণের মাটিতে, উঁচু জমি যেখানে পানি জমে না। এছাড়াও সমুদ্রতীরবর্তী লবণাক্ত কাদা মাটিতেও ভাল জন্মে।

জমি তৈরী : ভালভাবে জমিতে সার ও চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদামাটিতে লাগানো যায়।

কাটিং এর সংখ্যা : প্রতি শতকে ৯৫ টি কাটিং (মোথা)

কাটিং লাগানোর দূরত্ব : লাইন থেকে লাইন-২ ফুট, কাটিং থেকে কাটিং-১ ফুট।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরীর সময় প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৮০ গ্রাম টিএসপি এবং ১২০ গ্রাম এমপি ও ৮০কেজি গোবর/জৈব সার। ঘাস লাগানোর ১ মাস পর প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০-৩০০ গ্রাম। প্রতিবার কাটার পর প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ২০০-৩০০ গ্রাম ।

জমি তৈরী : উত্তমরূপে চাষ করে জমি তৈরী করতে হবে। বন্যা পরবর্তী কাদা মাটিতে লাগানো যায়।

সেচ : খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর।

ঘাস কাটার সময় : গ্রীষ্মকালে ৩০-৪৫ দিন পরপর ,শীতকালে ৫০-৬০ দিন পরপর

বছরে কতবার কাটা যায় : ১ম বছরে ৫-৬ বার ,২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছরে ৭-৯ বার কাটা যায়।

বছরে কাটা ঘাসের উৎপাদন : প্রতি শতাংশে আনুমানিক ৮০০ কেজি।

জাম্বু : এক থেকে বহুবর্ষজীবি। একবার লাগালে দুই থেকে আড়াই বছর পর্যন্ত উৎপন্ন হয়।

রোপনের সময় : যে কোন সময়, তবে ফালগুণ চৈত্র হচ্ছে উত্তম সময়।

মাটির ধরণ : প্রায় সব ধরণের মাটিতে এ ঘাস চাষ করা যায়। তবে বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

কাটিং এর সংখ্যা : ১৬০টি কাটিং/শতাংশে

বীজের পরিমাণ : ৩০ গ্রাম/শতাংশে

সার প্রয়োগ ও ঘাস লাগানোর সময় : জমি তৈরীর সময় প্রতি শতাংশে ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ২৮০ গ্রাম টিএসপি এবং ১২০ গ্রাম এমপি ও ৮০কেজি গোবর/জৈব সার।

সেচ : খরা মৌসুমে ১৫-২০ দিন পরপর

ঘাস কাটার সময় : গ্রীষ্মকালে ৩০-৪৫ দিন পরপর, শীত কালে ৪০-৫০ দিন পরপর।

বছরে কতবার কাটা যায় : ১ম বছর ৫-৬ বার, ২য় বছর ৭-৮বার।

বছরে কাটা ঘাসের উৎপাদন : প্রতি শতাংশে আনুমানিক ৬০০ কেজি।

ভূট্টা : ভুট্টার জীবন কাল ১৩০-১৫০ দিন। উচতা ৬ফুট থেকে আট ফুট।

মাটির ধরণ : সাধারণত উঁচু জলাবদ্ধতা মুক্ত বেলে দোঁ-আশ মাটিতে ভাল হয়।

জমি তৈরী : জমিকে ৩-৪ বার চাষ দিয়ে ঝরঝরা করে তৈরী করতে হবে।

বীজের হার : প্রতি শতাংশে ১০০ গ্রাম ।

বপন পদ্ধতি : ছিটিয়ে বা সারিতে লাগানো যায়। সারি থেকে সারি দুরত্ব ২ফুট, চারা থেকে চারা দুরত্ব ১ ফুট।

বপন কাল : উপযুক্ত সময় অক্টোবর থেকে নভেম্বর, তবে বছরের অন্য সময়েও লাগিয়ে দেখা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ : জমি তৈরীসময় প্রতি শতাংশে গোবর বা জৈব সার ৬০ কেজি, টিএসপি ৪০০ গ্রাম, জিপসাম ২০০ গ্রাম। ৩০ দিন বয়সে আগাছা পরিষ্কারের সময় প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম, ৬০-৭০ দিন বয়সে প্রতি শতাংশে ইউরিয়া ৫০০ গ্রাম।

সেচ : প্রথম চেস- ৩০ দিন বয়সে আগাছা পরিস্কার ও মাটি আলগা করে। দ্বিতীয় সেচ- ৬০ দিন বয়সে গাছের গোড়ার মাটি তুলে আইল বাঁধিয়ে সেচ দিতে হবে।

কর্তনের সময় : সাড়ে ৪ থেকে ৫ মাস বয়সে।

ঘাস উৎপাদন : প্রতি শতাংশে আনুমানিক ১০০ কেজি।

এছাড়াও গবাদিপ্রাণিকে ধইঞ্চা, ইপিল-ইপিল গাছের পাতা, বাবলা পাতা, কাঁঠালের পাতা ইত্যাদি চাষ করে খাওয়ানো যায়। গবাদিপ্রাণিকে খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে আশপাশের খামারীর বা উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস থেকে আরেকটি উন্নতজাতের জার্মান ঘাসের কাটিং সংগ্রহ করে নীচু জমি বা জলাবদ্ধ এলাকায় চাষ করা যায়।

লুসার্ন (আলফাআলফা)

চাষাবাদ নির্দেশিকা

শুটি জাতীয় প্রাণি খাদ্যের মধ্যে আলফা আলফা অন্যতম। আলফা আলফ একটি বহুবর্ষজীবি ফসল হিসেবে এর চাষ হয়। বছরে ৮-১০ বার সবুজ গোখাদ্য পাওয়া যায়। সবুজ আলফা আফলা-তে শতকরা ৩.২ ভাগ হজম যোগ্য প্রোটিন থাকে। ফডার জাতীয় ঘাসের মধ্যে লুসার্ন সবচেয়ে আমিষ সমৃদ্ধ যার পরিমান ১৫-২০%। শুকনো আবহাওয়ায় এর চাষ ভাল হয়। আলফা আলফা সবুজ ঘাস বা খড় হিসেবে গবাদিপ্রাণিকে খাওয়ানো যায়।

জলবায়ু : গরম ও ভিজে জলবায়ুতে আলফা আলফা বেশি তাপসহ্য করতে পারে। কিন্তু ভিজে অঞ্চলে বেশি তাপ সহ্য করতে পারে না।এ ফসল অনা বৃষ্টি সহ্য করতে পারে । সেজন্য গরম ও অল্প বৃষ্টি পাতের অঞ্চলে ভাল জন্মায়।

মাটি : প্রায় সব রকম মাটিতেই আলফা আলফা চাষ করা যায়। তবে পানি বেরোতে পারে, এমন উর্বর দোঁ-আশমাটি-ই সব চেয়ে ভাল। মাটি অম্ল বা ক্ষার হলে সে মাটিতে আলফা আলফা ভাল জন্মে না। ৫-৬ বার আড়া আড়ি ও লম্বা লম্বি লাঙ্গল আর মই দিয়ে মাটি ভাল ভাবে তৈরি কওে নিতে হবে। জমি তৈরির সময় একরে ৪০-৫০ কুইন্টাল গোবর অথবা আবর্জনা সার দিতে হবে। জল সেচের সুবিধার জন্য জমিকে ছোট ছোট খন্ডে ভাগ করতে হবে।

বীজ বোনা : সাধারণত: অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়নমাসেরমাঝামাঝি)বীজ বোনাযায়। তবে কার্তিক মাস-ই আলফা আলফা বোনার ঠিক সময়। বীজের সঙ্গে রাইজোরিয়াম জীবানু মিশিয়ে বুনতে হবে। এটা সম্ভব নাহলে আগের বছর যে জমিতে আলফা আলফা চাষ হয়েছিল সেই জমির কিছু মাটি বীজের সঙ্গে মিশিয়ে বোনা দরকার । বীজ হাতে ছিটিয়ে বা ১২ ইঞ্চি (৩০ সে.মি.) অন্তর সারিতে বোনা যায়। হাতে ছিটিয়ে বোনার পর মই দিয়ে বীজগু লোকে মাটি চাপা দিতে হবে। একরে ৬-৮ কেজি বীজ লাগে্ তবেবীজ বোনা যন্ত্র দিয়ে বুনলে একরে ৪-৫ কেজি বীজ বোনা লাগে।

সার প্রয়োগ : একর প্রতি ১০ কেজি নাইটোজেন , ২৫ কেজি ফসফরাস ও ১২.৫ কেজি পটাসিয়াম দিতে হবে। আলফাআলফা শুটিজাতীয়ফসল বলে ফসফেট মিশ্রিত সার দিলে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। জমি তৈরিকরার সময় একরে ১০ কেজি সোহাগা (বোরাক্স) প্রয়োগ করলে ফসলভাল হয়।

মাধ্যমিক পরিচর্যা : অংকুর বেরোনোর পর আলফা আলফা কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খুব ধীওে ধীরে বাড়ে। এ সময় সম্ভব হলেএক বার নিড়ানী দিতে পাড়লে খুব ভালো হয়। তাছাড়া ফসল কেটে নেবার পর আগাছা তুলে দিতে হবে।

পানি সেচ : আলফা আলফা চাষে পানি খুব বেশি লাগে। গাছ ভাল ভাবে মাটিতে লেগে যাবার আগে পর্যন্ত ৫-৭দিন পর পানি সেচ দিতে হবে। সাধারণত জমি ডুবিয়ে পানি সেচ দেয়া দরকার ।

ফসলকাটা : বীজ বোনার ৬০-৭০ দিন পর গাছ ৮ ইঞ্চি (৩০ সে.মি.) লম্বা হলে ফসল প্রথম বার কাটার সময় হয়। ফসলের বার অনুযায়ী ৫-৬ সপ্তাহ পর ফসল কাটা যায়। বেশি ফলন পাবার জন্য যখন শতকরা ১০-১৫ টি গাছে ফুল ফোটে, তখন আলফা আলফা কাটাই ভাল। বছরে ৬-৮ বার ফসল কাটা যায়।

ফলন : একত্রে ২৪০-৩২০ কুইন্টাল সবুজ গোখাদ্য পাওয়াযায়।

জাত : আলফা আলফা এর কয়েকটি জাত আছে। যথাঃ আলফা গোল্ড, আলফা সিলভার, আলফা সুপার।

জার্মান ঘাসের চাষাবাদ প্রণালী

এটি একটি পানি প্রিয়, বহুবর্ষজীবি, গ্রীষ্মমন্ডলীয় ঘাস। লতার মত দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ঘাসের বৈশিষ্ট্য

ঘাসটি মূলত লতার মত। কান্ড গোলাকার ও ভিতরটা ফাঁপা। পাতা লম্বা ও মসৃণ। এর কান্ড বা মূলসহ কান্ড রোপণ করা যায়। এই ঘাস শীত সহ্য করতে পারে না বিধায় শীতকালে উৎপাদন কম হয়। সাধারণত ৫-৭ ফুট লম্বা, ১ ইঞ্চি প্রশস্ত এবং ১-২ ফুট পাতা বিশিষ্ট হয়।

মাটির ধরণ

প্রায় সব ধরণের মাটি যেমন উঁচু, নিচু, ঢালু, জলাবদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে এবং পতিত জমিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি

জমির আগাছা দূর করার জন্য কমপক্ষে ২-৩ টি চাষ দিতে হবে। জমির আজেবাজে ঘাস মই দিয়ে নষ্ট করে মাটি কাদা করে এ ঘাস রোপণ করতে হবে। চুড়ান্ত চাষের পূর্বে শতাংশ প্রতি ১০-১৫ কেজি গোবর অথবা খামারজাত পঁচাআবর্জনা সরবরাহ করলে ভাল ফসল আশা করা যায়।

চাষ প্রণালী ও সময়

সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ্য মাস বা বর্ষার সময় অথবা সেচের সুবিধা থাকলে শুষ্ক মৌসুমেও রোপণ করা যায়। বীজ হিসাবে কান্ড বা গোড়াসহ কান্ড ব্যবহার করা যায়। প্রতি কাটিং বা চারায় ২-৩ টি গিঁট থাকতে হবে। রসযুক্ত বা কাদাযুক্ত মাটিতে রোপণ করলে শুইয়ে অথবা পানিযুক্ত মাটিতে রোপণ করলে ৪৫০ ডিগ্রি কোনে হেলান দিয়া কাটিং এর মাথা পানির ওপর রাখতে হবে।

ঘাসের কাটিং রোপণের নিয়ম

এই ঘাস সারিবদ্ধ বা সারি ছাড়াও রোপণ করা যায়। সারি থেকে সারি ২.৫০-৩.০০ ফুট, কাটিং থেকে কাটিং ১.০০-১.৫০ ফুট এবং ৮-১২ ইঞ্চি গভীরে কাটিং রোপণ করতে হবে।

সার ও সেচের পদ্ধতি

জমি প্রস্তুত করার সময় শতাংশ প্রতি ১৫-২০ কেজি গোবর সার অথবা কম্পোষ্ট প্রাথমিকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এছাড়া জমি তৈরির সময় শতাংশ প্রতি ২০০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম টিএসপি এবং প্রতি কাটিং এরপর শতাংশ প্রতি ১৫০-২০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এছাড়াও গ্রীষ্মকালে ১/২ মাস পরপর পানি সেচের বিশেষ প্রয়োজন।

ঘাস কাটার নিয়ম ও উৎপাদন

চাষের ২-৩ মাসের মধ্যে প্রথমবার কাটা যায় এবং পরবর্তীতে ৩-৪ সপ্তাহ পরপর ঘাস কাটা যায়। বৎসরে ৮-১০ বার গবাদিপ্রাণিকে ঘাস কেটে খাওয়ানো যায়। বাৎসরিক উৎপাদন শতাংশ প্রতি প্রায় ৫০০-৬০০ কেজি।

ঘাস খাওয়ানোর নিয়ম ও সংরক্ষণ

এই ঘাস ৩-৪ সপ্তাহ পরপর গবাদিপ্রাণিকে কেটে খাওয়ানো যায়। ছোট ছোট টুকরা করে খাওয়ালে অপচয় কম হয়। ঘাসে জলীয় অংশের পরিমাণ বেশি থাকায় খড়ের সাথে মিশ্রিত করে খাওয়ানো যায়। ঘাস উৎপাদন বেশী হলে সাইলেজ বা হে তৈরী করে সংরক্ষণ করে খাওয়ানো যায়।

সবুজ ঘাসের বিকল্প হিসাবে সাইলেজের গুরুত্ব

পাঠপরিকল্পনা

ভুমিকা

দুগ্ধজাত গবাদিপ্রাণি পালন বাংলাদেশী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খামারীদের জীবন-জীবিকার মান উন্নয়নে একটি অবিচ্ছেদ্য এবং সমন্বিত অংশ। আমাদের দেশে দুগ্ধজাত গবাদিপ্রাণি উৎপাদনশীলতার মাত্রা সীমাবদ্ধতার কারণ হচ্ছে প্রধানত জেনেটিক এবং পুষ্টির অভাব। যদি না খাদ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করা হয়, তাহলে এই প্রাণীদের সম্পূর্ণরূপে সম্ভাব্য জেনেটিক শ্রেষ্ঠতা প্রকাশ করতে কঠিন হতে পারে। উৎপাদন সর্বাধিক করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দুগ্ধজাত গবাদিপ্রাণিদের গুনগত মানের খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা একটি মৌলিক পদ্ধতি। দুগ্ধজাত গবাদিপ্রাণি পালন নারীরদের নিয়মিত দৈনিক আয়, পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবারের উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক নিয়ামক হতে পারে। দানাদার ফিড এবং সবুজ ঘাসের পরিমাণগত এবং গুণগত ঘাটতি দুধ উৎপাদন ও প্রাণীর কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করে। স্থানীয় গাভীর গড় দুধ উৎপাদন ১.৫ লি. প্রতিদিন এবং ক্রস ব্রিড গাভীতে ৫-৮ লিটের বিপরীতে ভাল মানের খাদ্য খাওয়ানো প্রয়োজন । কিন্তু খামারীগণ যা সাশ্রীয় মূল্যে পাচ্ছে না। তাই কৃষকের সংকর জাতের গাভী পালন করে দুই গুণ পর্যন্ত আয় বাড়ানোর জন্য খাদ্য খরচ সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠছে। তাই এ ক্ষেত্রে, দুগ্ধজাত খামারকে অধিক লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সাইলেজ হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াজাত গো খাদ্য।

সেশন কার্যক্রমের সংক্ষিপ্তরূপ

মোট সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

উপকরন : পোস্টার পেপার (বড়), মার্কার কলম, ফ্লিপ চার্ট ও সাইলেজ

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, হাতে কলমে সাইলেজ তৈরি

সহায়তাকারী দিনের আলোচ্য সূচি এবং এর উদ্দেশ্য অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করবেন ।
সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের গবাদিপ্রাণির সবুজ ঘাস সংরক্ষণে সাইলেজ তৈরী বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন।
সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- আমাদের মধ্যে সবাই কি গরু মোটাতাজাকরণ করি ?
- আমরা কারা কারা দুগ্ধজাত গবাদিপ্রাণি পালন করি ?
- গরুকে কি কোন প্রক্রিয়াজাত খাবার দেই ?
- সাইলেজ কি ? এ খাবার এ লাভ কি ? এ খাবার আমরা নিজেরা তৈরি করতে পারি কি ?
- আপনি আপনার গরুকে কি কি খাদ্য দেন ?
- প্রক্রিয়াজাত খাদ্য কি ?
- খাদ্যকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায়?
- কি ভাবে সাইলেজ তৈরি করতে হয় ?
- সাইলেজ তৈরিতে কি ধরণের ফডার বা ঘাস দরকার হয় ?

- বেল সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়াটি কি ?
- বেল সাইলেজ কত দিন সংরক্ষণ করতে হয় ?
- সাইলেজের উপকারিতা কি কি ?
- ভাল সাইলেজের চেনার উপায় বা বৈশিষ্ট্য কি কি ?
- ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে কত কেজি সাইলেজের প্রয়োজন?
- দিনে কয় বার করে সাইলেজের খাদ্য দিতে দিতে হবে ?

সহায়তাকারী সেশনের পূর্বে সংগৃহীত সাইলেজ দিয়ে হাতে কলমে খাওয়ানো প্রক্রিয়াটি করে দেখাবেন।

আলোচনার সময় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া যেতে পারে;

- সাইলেজ তৈরির উপাদান গুলোর নাম বলুন ?
- খরচ কেমন হবে ?
- আমরা আমাদের এই অভিজ্ঞতা কিভাবে অন্য কৃষকদের মাঝে বিনিময় করতে পারি?

সহায়তাকারী আলোচনার সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন। সাইলেজ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা করবেন। সবশেষে সহায়তাকারী সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে সেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

কারিগরি নোট

সাইলেজ

সাইলেজ হলো গাঁজনকৃত সবুজ ঘাস অথবা সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলা হয়ে থাকে। এক কথায়, উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত (৬০-৬৫%) সবুজ ঘাসকে বায়ুহীন পরিবেশে সংরক্ষণ করে প্রক্রিয়াজাত ফডারকে বা সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলে।

সাইলেজ তৈরির মূলনীতি ঃ

যখন উদ্ভিদ কোষ অক্সিজেন বিহীন অবস্থায় ফারমেন্টেড হয়, ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া (LAB) নামক উপকারী ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং উদ্ভিদের উপাদানে শর্করা এবং অন্যান্য কার্বোহাইড্রেটকে গাঁজন করে তখন ল্যাকটিক এসিড তৈরী হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়াটি ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি করে, যা সাইলেজের pH কমিয়ে দেয় এবং ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ছত্রাকের বৃদ্ধিকে বাধা দেয়।

ফলস্বরূপ অম্লীয় পরিবেশ (ল্যাকটিক এসিড) সবুজ ঘাসের পুষ্টি সংরক্ষণ করতে এবং সময়ের সাথে সাথে এর গুণমান বজায় রাখতে সহায়তা করে।

সাইলেজ তৈরীতে উপযোগী ফডার বা ঘাস

বিভিন্ন ধরনের ঘাস হতে সাইলেজ তৈরি করা হয়ে থাকে। সাইলেজ তৈরি করার জন্য সাধারণত নন-লিগিউম জাতীয় ফডার বা সবুজ ঘাস সবচেয়ে বেশি উপযোগী। যেমন- ভূট্টা, যোয়ার, নেপিয়ার প্রভৃতি অন্যতম।
আবহাওয়া, খামারের আকার, খামারির অর্থনৈতিক অবস্থায় এবং উপযোগীতার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ তৈরীতে বিভিন্ন প্রকার সাইলো পিট ব্যবহার করা হয়।

গ্যাস টাইট সাইলো : ক) কংক্রিট স্টেভ খ) ইটের স্টেভ
পিট বা গর্ত সাইলো :
টাওয়ার সাইলো : ক) কংক্রিট স্টেভ খ) কাঠের স্টেভ গ) ইটের স্টেভ
সমান্তরাল সাইলো : ক) ট্রেঞ্চ সাইলো (মাটির গর্ত) খ) বাঙ্কার সাইলো (মাটির উপর)
স্বল্পস্থায়ী সাইলো : প্লাস্টিক বা পলিথিন ব্যাগ সাইলো

বেল সাইলেজ তৈরি করতে এই পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করা হয়

ফডার নির্বাচন করা ঃ সাইলেজ তৈরির জন্য উপযুক্ত ফসল বেছে নিতে হয়। বেল সাইলেজের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ ফসলের মধ্যে রয়েছে ঘাস, শিম (যেমন ক্লোভার বা আলফা আলফা), বা ভুট্টা বা বার্লি জাতীয় শস্য।

সঠিক পর্যায়ে ফসল কাটা ঃ সাইলেজ তৈরির জন্য সর্বোত্তম পর্যায়ে ফসল সংগ্রহ করণ। এই পর্যায়টি ফসলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। তবে সাধারণত ফসলের পর্যাপ্ত উচ্চতা এবং পরিপক্কতায় পৌঁছালে সাধারণত ফুল ফোটার আগে কাটা হয়।

কাটা এবং অবস্থা : ফসল কাটার জন্য একটি ঘাস কাটার যন্ত্র বা ফরেজ হারভেস্টার ব্যবহার করা হয়। কাটা যতটা সম্ভব মাটির কাছাকাছি করা উচিত যাতে সর্বোচ্চ ফলন হয়। যদি প্রয়োজন হয়, দ্রুত এবং আরও অভিন্ন শুকানোর জন্য কান্ডগুলিকে চূর্ণ করে বা গুঁড়ো করা হয়।

ফডারকে শুকানো : কাটা ফসলকে কিছু সময়ের জন্য জমিতে শুকিয়ে নিতে হয়। এই প্রক্রিয়াটিকে উইল্টিং বলে। প্রক্রিয়াটি আর্দ্রতার পরিমাণ হ্রাস করে এবং সাইলেজের গুণগতমান উন্নত করে। শুকিয়ে যাওয়ার সময়কাল ফডার এবং আবহাওয়ার অবস্থার উপর নির্ভর করে, তবে সাধারণত এটি কয়েক ঘন্টা থেকে এক দিন পর্যন্ত হয়।

বেলস তৈরি : একবার ফডার কাঙ্খিত শুকনো অবস্থায় পৌঁছে গেলে, এটিকে একটি গোল বেলার বা একটি বড় বর্গাকার বেলার ব্যবহার করে বেলে তৈরি করা হয়। যতটা সম্ভব বাতাসকে বের করে দিতে হবে যাতে বেলগুলি শক্তভাবে সংকুচিত করা হয়েছে বলে নিশ্চিত হয়।

বেলগুলি মোড়ানো : একটি বিশেষ বেল রেপিং মেশিন ব্যবহার করে প্রতিটি বেলকে পৃথকভাবে মোড়ানো হয়। মোড়ানো উপাদানটি সাধারণত প্রসারিত প্লাস্টিকের ফিল্ম যা বেলের চারপাশে একটি বায়ুরোধী সীল তৈরি করে। এই পদক্ষেপটি ঘাসকে সংরক্ষণ এবং গাঁজন করার জন্য একটি অনুকূল অ্যানেরোবিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেলগুলি সংরক্ষণ করন : মোড়োনো বেলগুলি সরাসরি সূর্যের আলো থেকে দূরে একটি সুনিষ্কাশিত জায়গায় সংরক্ষণ করতে হয়। আদর্শভাবে, মাটি থেকে আর্দ্রতা রোধ করতে কংক্রিট বা কাঠের মতো শক্ত পৃষ্ঠে এগুলিকে সংরক্ষণ রাখা ভাল। বেলগুলিকে এমনভাবে সাজিয়ে রাখতে হয় যাতে প্রাণিগুলো সহজে খেতে পারে।

গাঁজন প্রক্রিয়া : বেলগুলি মোড়ানো পরিবেশের ভিতরে গাঁজন করা হবে। এই গাঁজন প্রক্রিয়াটি ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দ্বারা চালিত হয়, যা ফডারের শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত করে, পিএইচ কমায় এবং ঘাসকে সংরক্ষণ করে।

পরিপক্কতার সময়কাল : সঠিক গাঁজন এবং সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে বেলগুলিকে কমপক্ষে ৪-৬ সপ্তাহের জন্য গাঁজন করতে দিতে হয়। ফলে, এই সময়ের মধ্যে সাইলেজের গুণগত মান উন্নত হতে থাকবে।

খাওয়ানো : পরিপক্কতার সময়কাল সম্পূর্ণ হলে, বেল সাইলেজ খাওয়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়। প্রয়োজনমতো গাঁটগুলো খুলে এবং সেগুলোকে গবাদিপ্রাণিদের সরবরাহ করা হয়। সঠিক স্টোরেজ নিশ্চিত করণ এবং নষ্ট হওয়া কমানোর জন্য খেয়াল রাখতে হয়। মনে রাখবে যে, বেল সাইলেজ তৈরির প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট ফসল, সরঞ্জাম এবং স্থানীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।

সাইলেজের উপকারিতা :

- ঘাসের সাইলেজে ৮৫% পুষ্টি পাওয়া যায়।
- উচ্চ মাত্রায় শক্তি পাওয়া যায়, ৭০ মেঘা জুল/কেজি শুষ্ক পদার্থ ।
- এখানে ঘাসের সমস্ত অংশই সংরক্ষণ করা যায়।
- বর্ষা মৌসুমে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ করা কঠিন কিন্তু সাইলেজ সহজেই করা সম্ভব।
- সাইলেজ অত্যন্ত সুস্বাদু ও ল্যাকটিক এসিড সমৃদ্ধ খাদ্য।
- পর্যাপ্ত পরিমানে আঁশ বা ফাইবার থাকে যা গবাদিপ্রাণির রুমেনের কার্যকারিতাকে অনেক গুন বাড়িয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে যে, মানুষের জন্য দই যেমন পেটের কার্যকারিতাকে বাড়ায়, তেমনি সাইলেজ গবাদিপ্রাণির রুমেনের কার্যকারিতাকে বাড়িয়ে দেয়।
- এটা আমিষ ও ভিটামিনের উৎস।
- সব চেয়ে কড় কথা হল সাইলেজ তৈরি করে যদি ভাল ভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে খামারের খাদ্য খরচ অনেক কমে যায়।

ভাল সাইলেজের চেনার উপায় :

- সাইলেজের রং হলুদাভ সবুজ।
- গন্ধ-আচারের ন্যায় অম্ল সুগন্ধ।
- পিএইচ মাত্রা ৩.৫-৪.০।
- সর্বোচ্চ ৪০% ড্রাই মেটার (শুষ্ক পদার্থ) থাকতে পারে।

গবাদিপ্রাণিকে সাইলেজ খাওয়ানো

গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০০ কেজি ওজনের একটি ষাঁড় দৈনিক গড়ে তার দৈহিক ওজনের ২% হারে সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। দুধাল গাভী প্রতিদিন কি পরিমাণ দুধ উৎপাদন করে তার উপর ভিত্তি করে সাইলেজ সরবরাহ করতে হয়। গবেষণায় দেখা যায় যে, যেখানে সাইলেজকে একক রাফেজ হিসেবে ব্যবহৃত, সেখানে একটি গাভী প্রতি ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য ৩ কেজি পরিমান সাইলেজ গ্রহণ করে থাকে। সাইলেজ এর সংগে কাঁচা ঘাস অথবা শুকনা খড়ও একত্রে গবাদিপ্রাণিকে খাওয়ানো যেতে পারে। সাধারণ নিয়মে দুই ভাগ সাইলেজ এর সাথে এক ভাগ কাঁচা ঘাস ও এক ভাগ খড় মিশিয়ে খাওয়ানো যেতে পারে।

ডেইরী কলাকৌশল, ঘি, চিজ, ক্রিম, দই তৈরি ও এর মার্কেটিং ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রয়োগ, ম্যাস্টাইটিস ও মিল্ক ফিভার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

দুধ ও দুগ্ধপণ্য উৎপাদনে দুধের গুনগত মান নির্নয় করা এবং এর মান ঠিক রাখা অত্যন্ত জরুরী। বাজারে গুনগত পণ্য সরবরাহ করতে পারলে উদ্যোগতাগণ টেকসই ব্যবসায়ী হিসাবে বাজারে টিকে থাকতে পারে। এছাড়াও গাভীর স্বাস্থ্য এর প্রতি যত্ন নেওয়া অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রয়োগ ম্যাস্টাইটিস ও মিল্ক ফিভার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপ করা।

উদ্দেশ্য

- দুধের গুনগত মান নির্ণয়ের কৌশল সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ করা
- দুধ ও দুগ্ধজাত পন্য উৎপাদন করা
- দুগ্ধজাত পন্য উদ্যোগতা তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করা
- ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রয়োগ, ম্যাস্টাইটিস ও মিল্ক ফিভার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা

সময় : ১.৫ ঘন্টা

উপকরন: টুকরো কাগজ/কার্ড, স্থায়ী মার্কার ইত্যাদি।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষণীয় দলীয় কাজ

ভূমিকা দিয়ে সেশনের সূত্রপাত করুন ও সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।

সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদেরঅভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- দুধ কি ? কি ভাবে দুধ পরীক্ষা করতে হয় ?
- দুধের ফ্যাট নির্ণয় কেন দরকার ? এটি কিভাবে নির্ণয় করে ?
- দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ এর নাম কি কি ?
- ছানা প্রস্তুত পদ্ধতি সম্পর্কে কে কে জানেন ?
- বাড়িতে কি আমরা ছানা, দই, ঘি মিষ্টি ইত্যাদি দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ তৈরি করতে পারি কি ?
- এ গুলো বাজারজাত করতে হলে আমাদের কি করতে হবে ?
- ওলান প্রদাহ ও দুধ জ্বর এর লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধ কি ?
- ড্রাই কাউ কি ? কি ভাবে দুধ না দেওয়া (ড্রাই কাউ) সময়ে গাভীর ব্যবস্থাপনা করবেন ?

কারিগরি নোট

দুধ পরীক্ষা

বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দুধের মান ও ভেজাল পরীক্ষা করা হয়। দুধ পরীক্ষার কতগুলি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হলো ।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(১) দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয়

স্বাভাবিক দুধের একটি সুনির্দিষ্ট আপেক্ষিক গুরুত্ব আছে। তাই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করে দুধে পানি মেশানো আছে কিনা জানা যায়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ

(ক) একটি কুয়েভের ল্যাক্টোমিটার। এই ল্যাক্টোমিটারের গায়ে ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। সাধারণত ৬০ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রার দুধে ১.০১৫ থেকে ১.০৪০ পর্যন্ত আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ণয় করা যায়। (খ) একটি থার্মোমিটার । একটি লম্বা সরু কাঁচে পাত্র বা কাচের সিলিন্ডার এবং (গ) পর্যাপ্ত দুধ।

পদ্ধতি

(ক) প্রথমে একটি কাচের সিলিন্ডার পূর্ণ করে দুধ নিতে হবে। পরে ল্যাক্টোমিটারকে সিলিন্ডারের দুধে ডুবাতে হবে।

(খ) ল্যাক্টোমিটার স্থির হলে পাশ থেকে তার রিডিং নিতে হবে।

(গ) সাধারণত ৬০ ডিগ্রি ফাঃ তাপমাত্রা বিশিষ্ট দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব সরাসরি নেয়া যায়। তবে দুধের তাপমাত্রার তারতম্যের ক্ষেত্রে রিডিং সংশোধন করে নিতে হবে। যেমন ৬০ ডিগ্রি ফাঃ এর অধিক প্রতি ডিগ্রী তাপমাত্রার জন্য ল্যাক্টোমিটার রিডিংয়ের সতে ০.১ যোগ করতে হবে ।অপর দিকে ৬০ ডিগ্রি ফাঃ এর নিচে প্রতি ডিগ্রী তাপমাত্রার জন্য ল্যাক্টোমিটার রিডিং থেকে ০.১ বিয়োগ করতে হয়। ল্যাক্টোমিটার সংশোধন পাঠ বলা হয়। মেযন যদি ৭০ ডিগ্রি ফাঃ দুধের ল্যাক্টোমিটারের রিডিং হয় ৩০, তবে ল্যাক্টোমিটার পাঠ হবে ৩০+(৭০-৬) ০.১ =৩০+১=৩১।

সুতারাং আপেক্ষিক গুরুত্ব হবে = + =১+০.০৩১ = ১.০৩১

স্বাভবিক দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.০২৮ থেকে ১.০৩২ এর মধ্যে থাকে। তাই দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি ১.০৩২৮ এর নিচে হয় তবে দুধে পানি মিশানো বলে ধরে নেয়া যায়।

আবার দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি ১.০৩২ এর অধিক হয় তবে দুধের ফ্যাট তুলে নিয়ে গুড়া দুধ বা ময়দা মিশানো হয়েছে বলে অনুমান করা যেতে পারে।

(২) দুধের ফ্যাট নির্ণয়

সাধারণত দুধের ফ্যাট শতকরা হিসেবে নির্ণয় করা হয়। প্রধানত নিম্নোক্ত কারণে দুধের ফ্যাট নির্ণয় করা প্রয়োজন।

(ক) দুধের ফ্যাট নিরূপণের মাধ্যমে দুধের মান নির্ণয় করা যায়।

(খ) মাখন ও পনির প্রস্তুতের জন্য দুধের ফ্যাটের অবস্থা জানা প্রয়োজন।

(গ) দুধে ভেজাল বিশেষ করে পানি মেশানো হয়েছে কিনা কিম্বা ফ্যাটে তুলে নেয়া হয়েছে কিনা তা নিরূপণ করা যায়। প্রধানত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দুধের ফ্যাটের পরিমাণ নিরূপণ করা যায়।

গার্বার পদ্ধতি

দুগ্ধজাত দ্রব্যসমূহ

দুধ পঁচন এবং অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায় না। তবে দুধ থেকে সহজেই নানা রকম উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য তৈরি করা যায়। প্রধানত যেসব খাদ্য দ্রব্য দুধ থেকে প্রস্তুত করা হয় সে সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো ।

(১) ননী

দুধের ফ্যাট অংশকে ঘনীভূত করে ননী প্রস্তুত করা হয়। দুধকে ফুটিয়ে রাখলে দুধের উপর যে স্তর পড়ে তাকে দুধ সর বা ননী বলা হয়। বর্তমানে ননী পৃথককিরণ যন্ত্রের মাধ্যমে ননী প্রস্তুত করা হয়। ননী তেলা দুধকে মাঠা তোলা দুধকে স্কীম মিল্ক বলে।

(২) মাখন

দুধের ননী থেকে মাখন তৈরি করা হয়। অথ্যাৎ দুধের ফ্যাট কনা গুলো একত্রে মিলিত হয়ে মাখনে পরিণত হয়। মাখন শতকরা ৮০-৮৪ ভাগ দুধের ফ্যাট থাকে। অবশিষ্ট অংশ থাকে পানি (১৬-১৮%) লবন (২-৪%, ছানা-০.১-৩.৫%) ও অন্যান্য দ্রবাদি । সাধারণত তিন রকমের মাখন তৈরি হয়।

(ক) দুধের মাখন

অল্প গরম দুধকে নেড়ে ঠান্ডা করে মুথুনির (বাশের তৈরি মন্থন যন্ত্র) সাহায্যে ধীরে ধীরে মন্থন করে যে মাখন ভেসে উঠে তাকে দুধের মাখন বলে। মাখন তোলা দুধকে টানা দুধ বলা হয়।

(খ) দধির মাখন

দধিকে মুথুনির সাহয্যে মন্থন করে যে মাখন পাওয়া যায় তাকে দধির মাখন বলে। দধি মন্থনস করে মাখন তোলার পর যে তরল পদার্থ থাকে তাকে দধি না বলে ঘোল বলা হয়। দধির মাখন স্বাদে একটু টক হয়।

(গ) ননী মাখন

স্বাভাবিক দুধের ননী থেকে তৈরি মাখনকে ননী মাখন বলা হয়। সাধারণত মাখন যন্ত্রের সাহায্যে এই মাখন তৈরি হয়। এ পদ্ধতিতে অধিক পরিমাণে ও উন্নত গুণ সম্পন্ন মাখন পাওয়া যায়।

(৩) ছানা

দুধের ছানা থেকে বিভিন্ন ধরনের মিষ্টান্ন দ্রব্য তৈরি হয়। যেমন-সন্দেস,রসগোল্লা,পানতোয়া,চমচম,মণ্ড ইত্যাদি। দুধের প্রোটিনের শতকরা ৮০ ভাগই কেসিন। ফুটন্ত দুধে অ্যাসিড প্রয়োগ করলে এই প্রোটিন পৃথক হয়ে যায়। দুধের এই পৃথককৃত প্রোটিনকেই ছানা বলে। তবে ছানাতে দুধের ফ্যাটও যুক্ত থাকে। ছানা তৈরির জন্য বিভিন্ন রকমের অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। যেমন কাগজি লেবুর রস,ছানার পানি, সাইট্রিক অ্যাসিড, ফিটকিরি, ক্যালসিয়াম ল্যাকটেট ইত্যাদি। তবে এসবের মধ্যে ছানা প্রস্তুতের জন্য ছানার পানিই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

ছানা প্রস্তুত পদ্ধতি

(ক) প্রথমে দুধকে উনানে ফুটাতে হবে। ফুটন্ত দুধে ছানার পানি ধীরে ধীরে ঢালতে এবং নাড়তে হবে।

(খ) সাধারণত যতক্ষণ পর্যন্ত ছানা সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত ছানার পানি অল্প অল্প করে মিশাতে থাকতে হয়।

(গ) ছানার পানির রং যখন সামান্য সবুজ রং ধারণ করবে তখনই বুঝতে হবে যে ছানা পুরোপুরি পৃথক হয়েছে।

(ঘ) এ অবস্থায় উনান থেকে পাত্র নামিয়ে নিয়ে পরিস্কার ছাকনি দিয়ে ছানা ছেকে নিতে হবে। এরপর পরিস্কার কাপড়ে বেধে ঝুলিয়ে রাখলে ছানার অধিকাংশ পানি ঝড়ে যায়।

(ঙ) ছানা কাটার পর যে সবুজে পানি টুকু পাওয়া যায় তাকে ছানার পানি বলা হয়। ছানার পানি সাধারনত পানি নয়। এ পানিতে দুধের শর্করা, সামান্য ফ্যাট, খনিজ পদার্থ ও ভিটামিন বি থাকে। তাই ছানার পানি ডায়রিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত রোগীদের উত্তম পথ্য হিসেবে বিবেচিত।

(চ) সাধারণত এক কেজি দুধে ২০০-২৫০ গ্রাম ছানা তৈরি হয। ছানাতে শতকরা প্রায় ২১ ভাগ প্রোটিন এবং ১৭.৫ ভাগ ফ্যাট থাকে। এছাড়া প্রতি ১০০ গ্রাম ছানাতে ২০৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১৩৮ মিলিগ্রাম ফসফরাস, ভিটামিন এ ৩৬৬ ইউনিট, ০.০৯ মিলিগ্রাম ভিটামিন-বি এবং ০.০২ মিলিগ্রাম ভিটামিন বি-থাকে।

(৪) দধি

দধি একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। দুধকে ভালভাবে ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিতে হবে। এরপর পরিস্কার পাত্র বা মাটির নতুন হাড়িতে দুধ ঢেলে নিতে হবে। যখন দুধ (৭০-৭৫ ফাঃ) অবস্থায় আসবে তখন দধি বীজ মিশাতে হবে। সাধারণত পূর্বের দধির কিছু অংশ দধি বীজ হিসেবে ব্যবহার হয়। ভাল দধি পেতে হলে অবশ্যই ভাল দধি বীজ ব্যবহার করতে হবে। দুধ বীজে নানা রকম অসংখ্যা বীজ থাকে। এর মধ্যে প্রধানত স্ট্রেপ্টোকোক্কাস ল্যাসটিস ও ল্যাকটোব্যিাসিলাস অ্যাসিডোফিলাস জীবানু থাকে। এসব জীবানু দুধের শর্করাকে ল্যাকটিক অ্যাসিড পরিণত করে। ফলে দুধ দধিতে পরিণত হয়। আর এই অ্যাসিডের কারণেই দধির স্বাদ টক হয়। সাধারণত দধি জমানোর জন্য শতকরা ২-৩ ভাগ দধির প্রয়োজন হয়। দধি বীজের পরিমান বেশি হলে বা দধিকে অনেক ক্ষণ রেখে দিলে দধি টক হয়ে যায় এবং পানি বেড়িয়ে পড়ে। আবর বীজের পরিমাণ কম হরে দধি জমে না। দুধে দধি বীজ মিশিয়ে ৯০-৯৫ ফাঃ তাপমাত্রায় ৬-৭ ঘন্টা রেখে দিলে ভাল দই জমে। গ্রামঞ্চলে এই তাপের জন্য ধির পাত্রের গায়ে চট জড়িয়ে বা পাত্রে খড় চাপা দিলে দধি জমানো হয়। দধির জমানো অংশ কেসিন ও ফ্যাট এবং জলীয় অংৈ লবন শর্করা ও অন্যান্য প্রোটিন থাকে। দধি ইচ্ছেমত টক বা মিষ্টি করা যায়। মিষ্টি দধি প্রস্তুতের জন্য সাধারণত প্রতি লিটার দুধে প্রায় ২৫০ গ্রাম চিনি মিশাতে হয়।

(৫) ঘি

বাংলাদেশে মোট উৎপন্ন দুধের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঘি প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। প্রকৃতপক্ষে ঘি জলীয় অংশ ছাড়া মাখন। মাখনে ফ্যাটের পরিমাণ শতকরা ৮৩.৫ ভাগ এবং ঘিয়ে প্রায় ৯৯ ভাগ। অর্থাৎ ঘিয়ের প্রায় সবটুকু ফ্যাট।

ঘিয়ের উপকারিতা

ঘিয়ের প্রায় সবটুকুই ফ্যাট। ঘি সহজেই দেহের কাজে লাগে। তাই ঘি খেলে শীর্ণকায় দেহে চর্বি ও লাবণ্য বাড়ে। ঘি দিয়ে নানা রকম মুখরোচক খাদ্য তৈরি হয়। এছাড়া দুধ থেকে পনির খোয়া ক্ষীর , ঘন দুধ,গুড়া দুধ, আইস ক্রিম ইত্যাদি তৈরি করা যায়।

ওলান প্রদাহ

যত প্রকার জীবানু আছে সকল প্রকার জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যে গুরুর দুধ বেশী হয় সে গরুর এই রোগ বেশী হয়।

লক্ষন

- গাভীর ওলানের অথবা দুধের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অস্বাভাবিক অবস্থা হওয়াই হলো ওলান প্রদাহের লক্ষণ।
- গাভীর দেহে জ্বর থাকতে পারে, ওলান ব্যাথাযুক্ত ফোলা থাকে।
- দুধের রং গন্ধে যে কোন পরিবর্তন হতে পারে।
- এ রোগে আক্রান্ত হলে ৭০% পর্যন্ত দুধ উৎপাদন কমে যায়।

ওলান প্রদাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

- প্রথমে প্রথম বাচ্চা দানকারী, তারপর সুস্থ ও ভাল গাভী এর পর চিকিৎসা প্রদান করে রোগ মুক্তি প্রাপ্ত এবং
- সর্বশেষ আকান্ত গাভী দহন করতে হবে।
- প্রতি গাভী দহনের আগে ভাল করে হাত ধুয়ে নিতে হবে।
- দহনের আগে জীবানু নাশক দিয়ে ওলান ও বাট ধুয়ে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ফেলতে হবে এবং দহন শুরু
- করার আগে দু'চার ফোটা দুধ ফেলে দিতে হবে।
- দহনের পর পরই খাবার দিতে হবে যেন ২ ঘন্টা পর্যন্ত বসতে বা বাট মাটির সংস্পর্শে আসতে না পারে।

দুধ জ্বর

- গাভীর শরীরে ক্যালশিয়ামের অভাবে এ রোগ হয়।

লক্ষন

- খাদ্য কম খায়, উত্তেজনা দেখা যায়।
- মাথা কাঁপতে থাকে, হাটতে গেলে কাত হয়ে পড়ে।
- দেহের একপাশে মাথা গুজে শুয়ে পড়ে।

প্রতিরোধ

- ক্যালশিয়াম সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য (যেমন- ডিসিপি, শামুক, ঝিনুক গুড়া) খাওয়াতে হবে। (কমপক্ষে গর্ভের প্রথম তিন মাস এবং বাচ্চা প্রসবের পর ৩ মাস।

দুধ না দেওয়া (ড্রাই কাউ) সময়ে গাভীর ব্যবস্থাপনা

শুষ্ক গাভীর যত্ন

গাভীর এক বিয়ানের দুধ দানের শেষ সময় থেকে পরবর্তী বাচ্চা প্রসব ও দুধদান কালের পূর্ব পর্যন্ত দুধবিহীন সময়কে গাভীর শুষ্ক কাল বলা হয়। আর বাচ্চা প্রসবের পূর্বে দুধবিহীন অবস্থার গাভীকে শুষ্ক গাভী বলাহয়। মহিষ গাভীর দুধদান কাল ৮-১০ মাস। দুটি বাছুর হওয়ার দুরত্ব ১১ থেকে ১৮ মাস। অথ্যাৎ মহিষ গাভী ৩ থেকে ৮

মাস (গড়ে ৫মাস) দুধ বিহীন শুষ্ক অবস্থায় থাকে। বাচ্চা প্রসবের পূর্বে প্রতিটি গাভী কিছুদিন দুধবিহীন শুষ্ক অবস্থায় থাকে। গাভীর ৬-৮ সপ্তাহ শুষ্ক কাল অত্যাবশ্যক । প্রদানত নিম্নোক্ত কারণে এ অবস্থার প্রয়োজন রয়েছে।

(ক) দুধ নিঃসরণকালীন অঙ্গের বিশ্রামের জন্য।

(খ) দুধ উৎপাদনের পরিবর্তে গর্ভস্থ ফিটাসের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য উপাদন সরবরাহ।

(গ) দুধ উৎপাদনকারীণ বাভীর দেহের ক্ষয়ক্ষতি বিশেষ করে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের পুনরুদ্ধারের জন্য।

(ঘ) বাচ্চা প্রসবের পূর্বে গাভীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য।

(ঙ) গাভীর গর্ভাবস্থার মেষ পর্যায়ের শুষ্ক কাল কম হরে পরবর্তী দুধদানকালে দুধের পরিমাণ কম হয়।

শুষ্ক গাভীতে রূপান্তরিত করার পদ্ধতি

- গাভীর দুধ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেলেই হঠাৎ করে দুধ দোহন বন্ধ করে দেয়।
- গর্ভাবস্থার শেষ পর্যায়ে শুষ্ককাল কম হলে পরবর্তী দুধদানকালে দুধের পরিমাণ কম হয়। তাই গর্ভাবস্থার শেষ দিকে দিনে একবার বা এক দিন অন্তর দুধ দোহন করেলে গাভী সহজেই শুষ্ক অবস্থায় ছৌছে। অবশ্য আংশিক দুধ দোহন করে ওলানে দুধের পচাপ হ্রাস করতেহয়।
- ম্যাস্টইটিস আক্রান্ত গাভীর দুধ সম্পূর্ণভাবে সুষ্ঠু চিকিৎসার প্রয়োজন হয।
- খাদ্য ও পানি সরবরাহ হ্রাস করা যায়। তবে গর্ভাবস্থার মেষ পর্যয়ে ফিাসের দ্রুত বৃদ্ধির কারনে গাভীকে উপযুক্ত পরিমাণে সুষম খাদ্য সরবরাহ করতে হয়।
- ঘাসের চরণ ভূমিতে প্রদিন ৬-৮ ঘন্টা গাভীকে চরালে অতিরিক্ত কোন দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়না।
- কাঁচা ঘাসের অভাবে শুষ্ক গাভীর দানাদার খাদ্যের প্রয়োজন হয়। এই সঙ্গে গাভীর বাসস্থান, শরীর পরিস্কার, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ডেইরী ভ্যালু চেইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা

পাঠপরিকল্পনা

ভূমিকা

ভ্যালু চেইনের ধারনাটি প্রথম উদ্ভাবন করেন পটার ১৯৭৯ সালে। মূল্য চেইনে বাজারের বিভিন্ন এক্টর (যেমন: উৎপাদক, ফরিয়া, পাইকার, আড়ৎদার, ব্যবসায়ী সংগঠন, কোম্পানি, ডিলার, খুচরা বিক্রেতা এবং ভোক্তা) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত থাকে। মূল্য চেইনের বিভিন্ন পর্যায়ে যদি সঠিক পণ্য নির্বাচন করে দরিদ্র জনগোষ্ঠি উৎপাদন ও বাজারজাতকরনে বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িত হতে পারেন তাহলে উৎপাদক, ক্রেতা, বিক্রেতা ও ভোক্তা(বিভিন্ন ধরনের মার্কেট এ্যাক্টর) হিসাবে উপকার পেতে পারেন ও তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে । যে কোন পণ্য উৎপাদনের পূর্বে অথবা উৎপাদন পর্যায়ে মূল্য চেইন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজারের সমস্যাসমুহ চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মার্কেট এ্যাক্টরদের প্রায় সকলেই উপকার পেতে পারে। এজন্য মূল্য চেইন সেসনটি জরুরী।

উদ্দেশ্য

- প্রশিক্ষণার্থীগণ ভ্যালুচেইন কি ভ্যালু চেইন এর এ্যাক্টর, ও মূল্য সংযোজন ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ভ্যালুচেইন এর মৌলিক ধারণা
- ভ্যালুচেইন উন্নয়ণের মৌলিক ধারণা
- ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রক্রিয়া
- মার্কেট সিস্টেম উন্নয়ণ
- বাজার ভিত্তিক সমাধা
- বাজার ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জেনে ও ভ্যালু চেইনে অন্তর্ভূক্ত হয়ে জীবিকা ও কর্মসংস্থান
- কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা যুক্ত হতে পারবেন।

সময় : ১ ঘন্টা ৫০ মিনিট

উপকরন : টুকরো কাগজ/কার্ড, স্থায়ী মার্কার ইত্যাদি।

পদ্ধতি : অংশগ্রহণমূলক আলোচনা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও শিক্ষণীয় দলীয় কাজ

ভূমিকা দিয়ে সেশনের সূত্রপাত করুন ও সেশনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন। সহায়তাকারী অংশগ্রহণকারীদেরকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত ঘটাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে বলবেন। সহায়তাকারী বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানার চেষ্টা করবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন সবার অংশগ্রহণ যেন নিশ্চিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হলো যা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে;

- ভ্যালু চেইন বলতে কি বুঝেন?
- বাজার এ্যাক্টর বলতে কি বুঝেন? একটি কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত কিভাবে পোঁছায়?
- পণ্য উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত পোঁছাতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা কি কি কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন?
- পণ্যের মূল্য/দাম উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত একই থাকে কিনা? পার্থক্য হলে কেন হয়?

ভ্যালু চেইন বলতে কি বুঝেন?
- বাজার এ্যাক্টর বলতে কি বুঝেন? একটি কৃষি পণ্য উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত কিভাবে পোঁছায়?
- পণ্য উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত পোঁছাতে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থা কি কি কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন?
- পণ্যের মূল্য/দাম উৎপাদনকারী হতে ভোক্তা পর্যন্ত একই থাকে কিনা? পার্থক্য হলে কেন হয়?

- প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় প্রয়োজনে আলোচনার সূত্র ধরিয়ে দিন।
- সহায়তাকারী প্রথমে ভ্যালু চেইনের সাথে জড়িত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ধারনা দিবেন।
- এরপর বাজার ব্যবস্থার সাথে জড়িত ৩ টি বিষয় যেমন কোর ভ্যালু চেইন, সহায়ক সেবা ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ প্রতিটির জন্য ৫ টি করে কার্ড মোট ১৫ কার্ড সদস্যদের দিবেন ও বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে কার্যসমূহ ধারাবাহিক স্থাপন করতে বলবেন।
- এভাবে সহায়তাকারী ভ্যালু চেইন বা বাজার পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা দিবেন। মতামতের ভিত্তিতে সেগুলো প্রয়োজনে সংশোধন করবেন।

কারিগরি নোট

ভ্যালু চেইন

ভ্যালু চেইন হলো একটি বাজার ব্যবস্থা/পদ্ধতি যেখানে একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবা কেনা বেচার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রভাবক বা এ্যাক্টর পণ্যের মূল্য সংযোজন বা লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কাজ কখনো কখনো একই প্রভাবক বা এ্যাক্টর একাধিক কাজও করতে পারেন) সম্পাদনের মাধ্যমে পরস্পর শিকল বা চেইনের মত সংযুক্ত থাকে।

বাজার ব্যবস্থা/পদ্ধতি

বাজার ব্যবস্থা/পদ্ধতি কোন বিচ্ছিন্ন ধারনা নয়, এটা কেবল ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর দ্বারাই গঠিত নয়। বরং বাজার ব্যবস্থা/পদ্ধতি একটি সামগ্রিক ধারনা যাহা মার্কেট এক্টর , মার্কেট ফ্যাংশন, সহায়ক সেবা, ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ এর সমন্বয়ে গঠিত। বাজারের সাথে জড়িত সকল বিষয়সমূহ আসলে বাজার ব্যবস্থাপনা/পদ্ধতি এর অর্ন্তভূক্ত । যেমন ক্রেতার চাহদা, বাজারদর উঠানামা ইত্যাদি বাজার পদ্ধতির অর্ন্তভূক্ত

মার্কেট এ্যাক্টর বা প্রভাবক

একটি পণ্য উৎপাদনের পূর্বে, উৎপাদন অথবা পণ্য উৎপাদনের পর থেকে ভোক্তার কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে যে সকল ব্যক্তি/সংস্থা জড়িত থাকেন তাদেরকে মার্কেট এক্টর/প্রভাবক বলে। পণ্যের ভোক্তা পর্যায়ে মূল্য নির্ধারনে মার্কেট এক্টর/প্রভাবকগণ বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকেন। যেমন উৎপাদনকারী, ফরিয়া, পাইকার ইত্যাদি মার্কেট এ্যাক্টর বা প্রভাবক এর উদাহরন।

অথবা ভ্যালু চেইন ফাংশনের কার্যক্রম যে ব্যক্তি বা সংস্থা সম্পাদন করেন তাদেরকে ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর বা প্রভাবক বলে।

মার্কেট ফাংশন

মার্কেট এ্যাক্টর বা প্রভাবক যে কার্য বা কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন ঐ কার্য বা কার্যক্রমকেই মার্কেট ফ্যাংশন বলে। যেমন পণ্য ক্রয় বা সংগ্রহ ফরিয়ার একটি ফ্যাংশন।

সহায়ক সেবা

সহায়ক সেবা বলতে মূল ভ্যালু চেইন বা কোর ভ্যালু চেইনকে (এরা তাদের পূর্ববর্তী এক্টরদের থেকে পণ্য ক্রয় করে তাতে ভ্যালু যোগ করে পরবর্তী এক্টরদের নিকট বিক্রি করে) সহায়তা করার জন্য অন্যান্য ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়। সহায়ক সেবা বলতে পরিবহন, অর্থ, বাজার সংক্রান্ত তথ্য, অবকাঠামো ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়সমূহকে বুঝানো হয়ে থাকে। সহায়ক সেবা মূল ভ্যালু চেইন এর অংশ নয় তবে সহায়ক সেবা ব্যতিত মূল ভেলু চেইন কাজ করতে পারে না।

কোর/প্রধান ভ্যালু চেইন

এটিকে অন্যভাবে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক্যকে বোঝায়। এটি বাজার পদ্ধতির প্রধান নিয়ন্ত্রক/বাহক। সকল কার্যক্রম এই কোর/প্রধান ভ্যালু চেইন কে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশঃ

ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ বলতে ব্যবসা সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা, নিয়ম, সামাজিক সংস্কার ও কালচার ইত্যাদিকে বুঝানো হয়।

ভ্যালু চেইন বিশ্লেষণ

মূল্য চেইন বিশ্লেষণ বলতে পণ্যের নির্বাচন (কি পণ্যের মূল্য চেইন করা হবে), মূল্য চেইনে কোন কোন এ্যাক্টর জড়িত থাকবেন, পণ্যের প্রাচুর্যতা কেমন পাওয়া যাবে, এ্যাক্টরদের মূল্য সংযোজন/লাভ কেমন থাকবে, সহায়ক সেবা ও বাজার সহায়ক পরিবেশের অবস্থা কেমন হবে ইত্যাদি অবস্থাকে বিশ্লেষণ বুঝায়। মূল্য চেইন বিশ্লেষণ করে একজন এ্যাক্টর ব্যবসা সংকান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে।

মূল্য সংযোজন

উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত কোন পন্য বা সেবা পৌছাতে বিভিন্ন এক্টরের মালিকানা পরিবর্তন, বাছাইকরন, মোড়কজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং বাজারজাতকরণে মূল্য যোগ করাকে মূল্য সংযোজন বলে। মূল্য চেইন এবং মূল্য সংযোজন দুটি ভিন্ন বিষয়। মূল্য চেইনে বিভিন্ন এক্টর যুক্ত থাকে কিন্তু মূল্য সংযোজনে পণ্যের মালিকানা পরিবর্তন কিংবা বাছাইকরন, মোড়কজাতকরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে গুনগতমানের পরিতবর্তন, মূল্য বৃদ্ধি এবং বাজারজাতকরণের মত বিষয়াদি যুক্ত থাকে। মূল্য চেইন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন এক্টরের ভূমিকা, উদ্দেশ্য, সীমাবদ্ধতা এবং উন্নয়ন। আর মূল্য সংযোজন অধ্যয়নের উদ্দেশ্য হল মূল্য সংযোজনের বিষয়, সীমাবদ্ধতা এবং উত্তরণের বিষয় সমূহ।

মূল্য সংযোজনের বিভিন্ন উপায়

কৃষক তার উৎপাদিত পন্যের বিভিন্ন উপায়ে মূল্য সংযোজন করতে পারে। যেমন:

- প্যাকেটিং
- বাছাইকরণ
- বিভিন্ন আকারের মিষ্টি
- মোড়কজাতকরণ
- প্রক্রিয়াজাতকরণ

ফসল সরাসরি বিক্রয় না করে এ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রয় করলে অধিক মূল্য পাওয়া যায়। যেমন : আলু থেকে চিপস তৈরি, দুধ থেকে ছানা, মাখন, ঘি তৈরি, টমেটো এবং মরিচ থেকে সস তৈরি। ফুলকপি এবং বাধাকপির পাউডার তৈরি, কুমড়ার জুস এবং সস তৈরি, কচুর কন্দ টুকরা টুকরা করে কেঁটে রোদে শুকিয়ে প্যাকেটজাত অথবা বোতলজাতকরণ, শুটকি মাছ তৈরি।

ভ্যালুচেইন

ভ্যালু চেইন সাধারণত অনেকগুলি কাজ ও অনেক এ্যাক্টরের সমন্বয়ে পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছায় এবং যেখানে প্রতিটি পর্যায়ে মূল্য সংযোজন হয় এবং মালিকানা পরিবর্তন হয় এবং এ কাজের সুযোগ স্থানীয়, জাতীয় বা আর্ন্তজাতিক হতে পারে।

পণ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে প্রতিটি ভৌত অবস্থার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উৎপাদনকারী থেকে শুরু করে পণ্য বা সেবা ব্যবহারের পর ব্যবহারকারীর মতামত পাওয়া পর্যন্ত সকল স্তরকে বোঝায়।

ডেইরী ভ্যালুচেইন ঃ

চিত্র ঃ একটি মৌলিক ভ্যালুচেইন ম্যাপ

মূল্য যোগান	২৫ টাকা / প্রতি লিটার **ফার্ম**	৪০ টাকা / প্রতি লিটার **কালেকশন/ চিলিং**	৪৫ টাকা / প্রতি লিটার **পরিবহণ**	৭৫ টাকা / প্রতি লিটার **কারখানা**	৮০ টাকা / প্রতি লিটার **খুচরা বিক্রেতা**	৯৫ টাকা / প্রতি লিটার **ভোক্তা**
খরচ	শ্রমিক জমি খাবার যন্ত্রপাতি গরুর ঘর গরুর যত্ন	পরীক্ষা শীতলীকরণ ট্যাঙ্ক স্থাপনা বিদ্যুৎ শ্রমিক	পরিবহণ জ্বালানী মেরামত চালক	মেশিন স্থাপনা বিদ্যুৎ প্যাকেটজাতকরণ বাজারজাতকরণ প্রশাসন	দোকান ভাড়া স্টোরেজ শ্রমিক বিজ্ঞাপন প্রশাসন শুল্ক	ক্রেতা সকল **সংযুক্ত মূল্য পরিশোধ করে**

ভ্যালু চেইনের কেন প্রয়োজন?

- বাজারে ছোট এবং মাঝারী উদ্যোক্তার অবস্থান চিহ্নিত করা যায়
- মার্কেট চ্যানেল বুঝা যায়
- মার্কেটের বিভিন্ন বাধা বা সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ চিহ্নিত করা যায়
- মার্কেট এ্যাক্টর এবং তাদের সম্পর্ক সনাক্ত করা যায়

ভ্যালুচেইনের মৌলিক ফাংশন বা কার্যাবলি

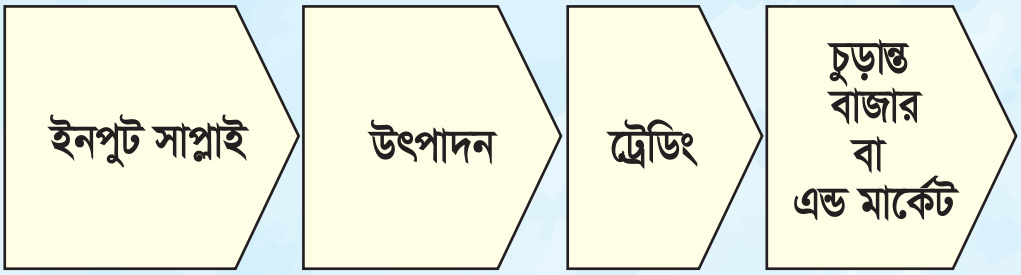

ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর

ভ্যালু চেইন এ্যাক্টর হলো কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি যারা একটি ভ্যালু চেইনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যেমন- সরবরাহকারী, ভোক্তা, নীতি নির্ধারক, মান উন্নয়নকারক, সেবাদানকারী, তথ্য দাতা/প্রদানকারী, সরকারী, বেসরকারী খাত, অলাভজনক সংস্থা, সংস্থার প্রতিনিধি ইত্যাদি।

বাজার ব্যবস্থা
অনানুষ্ঠানিক নেটওয়ার্ক
প্রাইভেট সেক্টর
সহায়তাকারী কার্যক্রম সমূহ (সাপোর্ট ফাংশনস)
তথ্য
দক্ষতা এবং ক্ষমতা
সমন্বয়
তথ্য ও যোগাযোগ (ইনফরমিং এন্ড কমিউনিকেটিং)
পণ্য উন্নয়ন
সংশ্লিষ্ট সেবা
এনজিও
চাহিদা
যোগান
নিয়মকানুন সমূহ
অনানুষ্ঠানিক নিয়ম ও প্রথা
নিয়ম নির্ধারণ ও প্রয়োগ
আইন সমূহ
মান সমূহ
নিয়ম কানুন (রুলস)
সরকার
ব্যবসা ব্যবস্থাপনা সংগঠন সমূহ

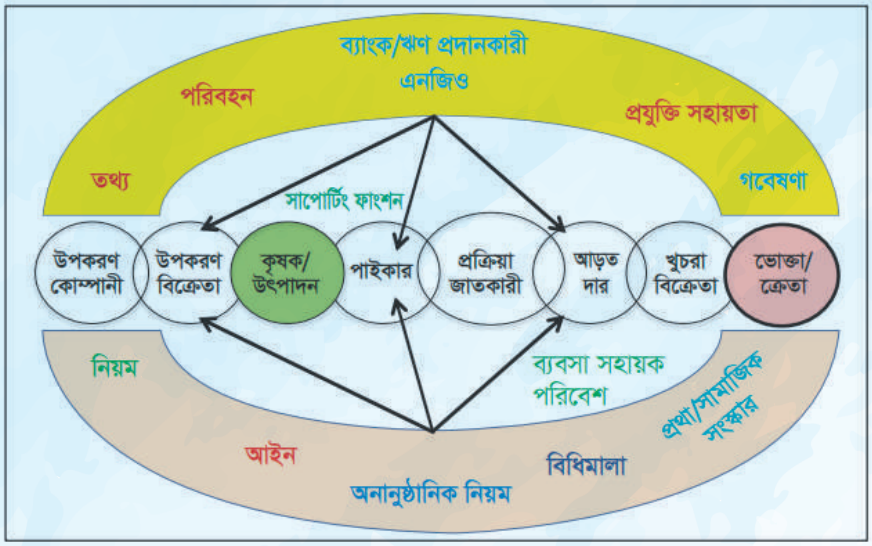

চিত্র ঃ ভ্যালু চেইন ডোনাট / ভ্যালু চেইন এর বৃহত্তর পরিসীমা

কারিকুলাম (Basic Training Curriculum)

উন্নত পদ্ধতিতে লোকাল হাঁস-মুরগি ও গবাদিপ্রাণি পালন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-বি

স্থানঃ ----------

তারিখঃ ----------

দিবস ঃ ০১

সময়	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সহায়তাকারী
০৯.০০-০৯.৩০	সুভ সূচনা	মৌখিক	
০৯.৩০-০৯.৪৫	সদস্যদের প্রত্যাশা যাচাই	মৌখিক	
০৯.৪৫-১১.০০	লোকাল হাঁস-মুরগির বাসস্থান ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১১.০০-১১.১৫	**চা-বিরতি**		
১১.১৫-১২.১৫	ডিম পাড়া, উমে বসা মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১২.১৫-০১.০০	হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও বাড়ন্ত মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০১.০০-০২.০০	খাবার ও নামাজের বিরতি		
০২.০০-০৩.০০	হাঁস-মুরগির সাস্থ্য পরিচর্যা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০৩০০.০৪.০০	সেশনের সারসংক্ষেপ	মৌখিক	

কারিকুলাম (Basic Training Curriculum)

উন্নত পদ্ধতিতে লোকাল হাঁস-মুরগি ও গবাদিপ্রাণি পালন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-বি

স্থানঃ ----------

তারিখঃ ----------

দিবস ঃ ০২

সময়	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সহায়তাকারী
০৯.০০-০৯.৩০	গত দিনের সেশনের উপর পুনঃ আলোচনা	মৌখিক	
০৯.৩০-১০.৩০	ছাগল-ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনার উপর মৌলিক আলোচনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১০.৩০-১১.১৫	গরু মোটাতাজাকরণ এ গরুর বাসস্থান ও এর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১১.১৫-১১.৩০	চা-বিরতি		
১১.৩০-১২.৩০	গরু মোটাতাজাকরণে খাদ্য ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১২.৩০-০১.৩০	গবাদিপ্রাণির বিভিন্ন রোগ ও তাদের প্রাথমিক প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	মৌখিক	
০১.৩০-০২.৩০	খাবার ও নামাজের বিরতি		
০২.৩০-০৩.০০	মোটাতাজা গরু বাজারজতকরণ	মৌখিক	
০৩.০০-০৪.০০	কবুতর পালন ব্যবস্থাপনার উপর মৌলিক আলোচনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০৪.০০-০৪.৩০	প্রশিক্ষণ সমাপনী		

উন্নত পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত গাভী পালন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-বি

স্থানঃ ----------

তারিখঃ ----------

দিবস ঃ ০১

সময়	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সহায়তাকারী
০৯.০০-০৯.৩০	সুভ সূচনা	মৌখিক	
০৯.৩০-০৯.৪৫	সদস্যদের প্রত্যাশা যাচাই	মৌখিক	
০৯.৪৫-১১.০০	দুগ্ধজাত গাভীর বৈশিষ্ট্য, বাংলাদেশে প্রাপ্য বিভিন্ন শংকর জাতের গাভীর বৈশিষ্ট্যাবলী ও প্রজনন, কৃত্রিম প্রজনন নিয়ে আলোচনা।	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১১.০০-১১.১৫	**চা-বিরতি**		
১১.১৫-১২.১৫	দুগ্ধজাত গাভীর বাসস্থান ব্যবস্থাপনা প্রসুতি গাভীর ঘরের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রসুতিগাভীর ঘর/বাছুরেরঘরের বৈশিষ্ট্য বাসস্থানেরজন্য স্থানীয়উপকরণ এর ব্যবহার	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১২.১৫-০১.০০	দুগ্ধবতী গাভীর যত্ন	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০১.০০-০২.০০	**খাবার ও নামাজের বিরতি**		
০২.০০-০৩.০০	দানাদার খাদ্য ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০৩০০.০৪.০০	সেশনের সারসংক্ষেপ	মৌখিক	

উন্নত পদ্ধতিতে দুগ্ধজাত গাভী পালন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ

চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-বি

স্থানঃ ----------

তারিখঃ ----------

দিবস ঃ ০২

সময়	আলোচ্য বিষয়	পদ্ধতি	সহায়তাকারী
০৯.০০-০৯.৩০	গত দিনের সেশনের উপর পুনঃ আলোচনা	মৌখিক	
০৯.৩০-১০.৩০	উন্নত ঘাস চাষ নেপিয়ার/জাম্বু/পারা/সুগারবিট/লুসার্ন	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১০.৩০-১১.১৫	ডেইরী ভ্যালু চেইন নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১১.১৫-১১.৩০	**চা-বিরতি**		
১১.৩০-১২.৩০	ডেইরী কলাকৌশল, ঘি, চিজ, ক্রিম, দই তৈরি ও এর মার্কেটিং নিয়ে আলোচনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
১২.৩০-০১.৩০	ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক প্রয়োগ, ম্যাস্টাইটিস ও মিল্ক ফিভার প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০১.৩০-০২.৩০	**খাবার ও নামাজের বিরতি**		
০২.৩০-০৩.০০	দুধ না দেওয়া (ড্রাই কাউ) সময়ে গাভীর ব্যবস্থাপনা	মৌখিক	
০৩.০০-০৪.০০	যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যবসার উন্নয়ন- টিকা প্রদান, দুধ সংগ্রহ ও বিক্রি, গুনগত খাদ্য সংগ্রহ ইত্যাদি)	মৌখিক ও হাতে-কলমে	
০৪.০০-০৪.৩০	**প্রশিক্ষণ সমাপনী**		

রেফারেন্স সমূহ

- প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (এলআরআই), মহাখালী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত রোগ প্রতিরোধ টীকা বুকলেট
- প্রশিক্ষণ হ্যান্ডআউট, বিএলআরআই
- ফার্মাকোলজি এন্ড টক্সিকোলজি, ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প
- আধুনিক প্রযুক্তিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ মাঠ পর্যায়ে সুফলভোগী খামারির প্রশিক্ষণ মডিউল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- প্রশিক্ষণ মডিউল (দেশি হাঁস-মুরগি ও গরু মোটাতাজাকরণ), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ন্যাশনাল লাইভস্টক ট্রেনিং ইন্সটিটিউট উদ্যোক্তা উন্নয়ন মডিউল
- প্রশিক্ষণ মডিউল (ডেইরি প্রাণির উৎপাদন ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা),প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
- সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কৃষক মাঠ স্কুল নির্দেশিকা (আই এফ এম সি-২) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
- কবুতর পালন নির্দেশিকা, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশন

সহযোগিতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

তত্ত্বাবধানে: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

যোগাযোগ

ব্র্যাক: প্রধান কার্যালয়, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২, www.brac.net

সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা: প্রধান কার্যালয়, চরবাটা, খাসেরহাট, সুবর্ণচর, নোয়াখালী

www.sagarika-bd.org